মোহম্মদ নুরুল আমিন

মুক্তিযুদ্ধের গল্প

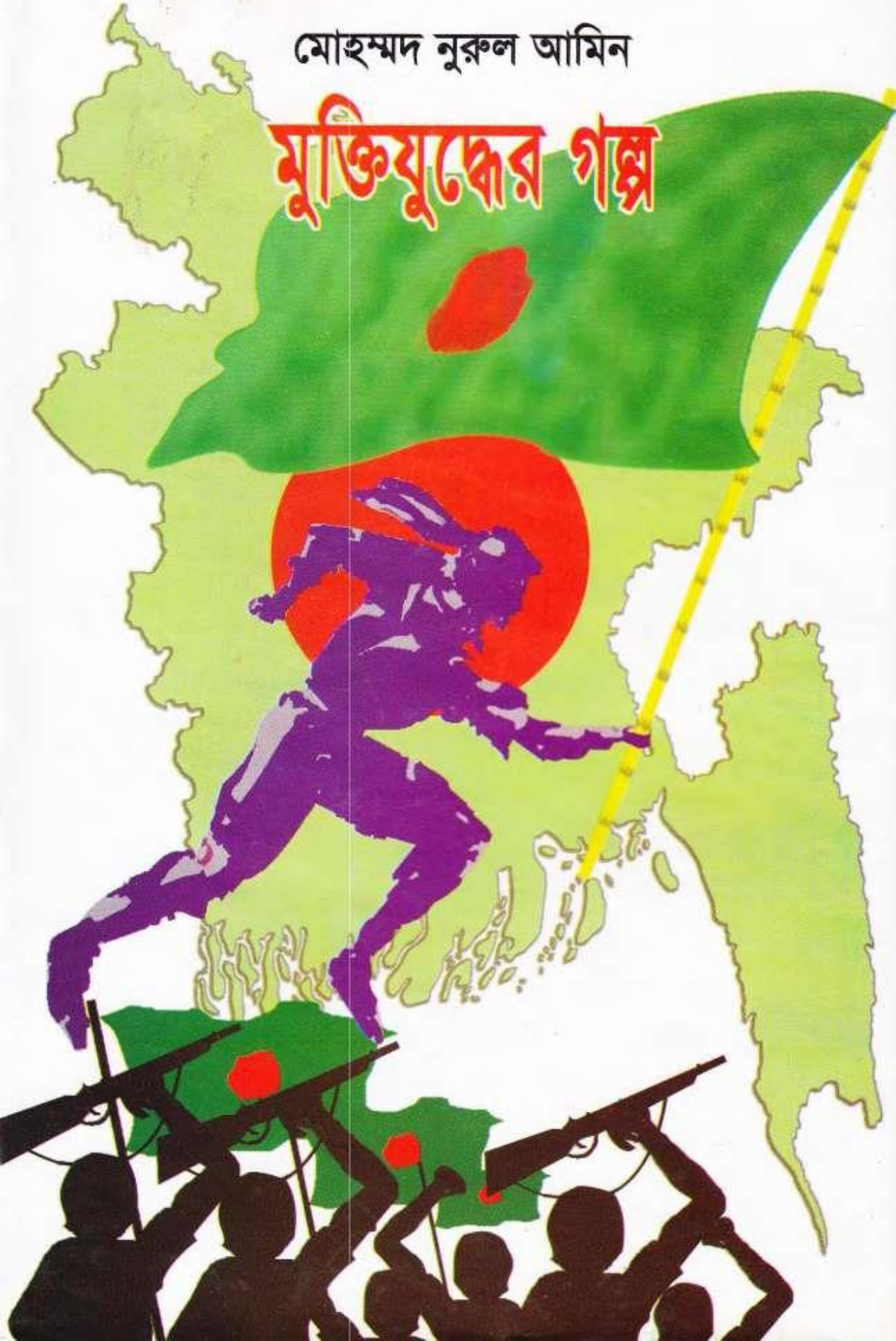

মুক্তিযুদ্ধের গল্প

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের গল্প

মোহাম্মদ নুরুল আমিন

দৃষ্টি প্রকাশ
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের গল্প / মোহাম্মদ নূরুল আমিন

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ জাহিদ হাসান
দৃষ্টি প্রকাশ
বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩, বাংলোবাজার(দ্বিতীয় তলা), ঢাকা- ১১০০

স্বত্ব ঃ প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪ ইং

বর্ণ সংযোজন ঃ জামান কমপ্রিন্ট
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, (চতুর্থ তলা)
বাংলোবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ঃ আল-মানার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৩৪, আর, এম, দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৮০.০০ (আশি) ঢাকা মাত্র

ISBN-984-8519-06-8

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জনগণ কমবেশি জড়িত আছে। জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য বেশি আগ্রহী। এ গ্রন্থখানাতে যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি লেখা সম্ভব নয় বিধায় যুদ্ধপূর্ব গণ আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পন পর্যন্ত বিষয়গুলো কিছু কিছু লেখা হয়েছে।

উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালে বৃটিশ উপনিবেশ থেকে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। আমাদের এ অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে অভিহিত হয়। বৃট্রিশ শাসনামলে আমাদের এ অঞ্চলকে যেভাবে শোষণ করা হত তদ্রূপই পশ্চিম পাকিস্তানীরা শোষণ করার পায়তারা করছিল। তারা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতিও হস্তক্ষেপ করে। আমাদের মাতৃভাষাকে জোর করে পদদলিত করতে চায়। আমরা যেন এক উপনিবেশ থেকে আর এক উপনিবেশে এসে দাঁড়ালাম।

উনিশ'শ আটান্ন সালে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল মোঃ আইয়ুব খান। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠতে লাগল। শুরু হল উনিশ'শ উনসত্তরের গণ আন্দোলন। আইয়ুব খান পদত্যাগ করলেন এবং ক্ষমতায় আসল আরেক সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহইয়া খান। তিনি উনিশ'শ সত্তর সালে সাধারণ নির্বাচন দিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ট দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন না। শুরু হল স্বাধীনতা যুদ্ধ।

এ দেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে অনেকে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে পাকিস্তানী শক্তি পরাজিত হয়। এ যুদ্ধের কিছু খণ্ড খণ্ড চিত্র এ গ্রন্থখানাতে লেখা হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের মানুষ কিছুটা হলেও মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে অবগত হতে পারবে এ গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করলে। আমার বিশ্বাস যতদূর সম্ভব সত্য চিত্রটি প্রকাশ করেছি।

এ গ্রন্থখানা রচনা করতে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র থেকে সহায়তা নিয়েছি। যাদের লেখা গ্রন্থ থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম। দৃষ্টি প্রকাশের মালিক জাহিদ হাসান যদি গ্রন্থখানা মুদ্রণে ও বাজারজাত করতে আগ্রহী না হত তবে হয়তো এ গ্রন্থখানা পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হত না। আমি আশা করি এ গ্রন্থ পাঠ করে পাঠকগণ আনন্দিত হবেন।

গ্রন্থখানা দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি থাকা অস্বাবিক কিছু নয়। তাই পাঠক সমাজের কাছে আমি অনুরোধ করছি যদি গ্রন্থের মধ্যে কোন অসংগতি দেখা যায় তবে আমাদের অবগত করাবেন। পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করা হবে।

বিনীত

মোহাম্মদ নূরুল আমিন

হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কিছু কথা

বিশ্বের ইতিহাসে মানুষ হত্যা হয়েছে অগণিত। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক মানুষ হত্যা বিশ্বের আর কোন দেশে হয়নি। এ সমস্ত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা। আমাদের হিসেবে মতে ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে কিন্তু জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী প্রায় ১৫ লক্ষ লোক মারা গেছে। যেটাই সত্য হোক এদেশের মানুষ যে মারা গেছে একথা সত্য।

উনিশ'শ একাত্তর সালের ঘটনা বর্তমান প্রজন্মের মানুষেরা কিছুই অনুভব করতে পারবে না। তারা শুধু শোনা কথা, এবং বিভিন্ন বইপত্র পড়ে জানতে পারবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা শুধু মানুষ হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি; এদেশের মা-বোনের ইজ্জত নিয়েও লুটো-পুটি খেলেছে। পুড়িয়ে দিয়েছে অসংখ্য বাড়ী ঘর, দোকান পাট। যুদ্ধের নয় মাসে দেশে কোন ফসল পর্যন্ত উৎপন্ন হতে পারেনি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে এদেশের মানুষের প্রতি অবজ্ঞা এবং পরিকল্পিতভাবে পরাধীন রাখার প্রয়াস থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই পূর্বপাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের দুর্ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। সরকারী চাকরী, সেনাবাহিনী নিয়োগ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। আমাদের মাতৃভাষাকে অবমূল্যায়ণ করেছিল। সত্তরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমশি করা এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি।

অনেক রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। এখন সকল জনসাধারণের কর্তব্য সমস্ত দুখ-কষ্ট, ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প বইখানা সুযোগ্য লেখক, গবেষক ও ভাষাবিদ মোহাম্মদ নূরুল আমিন সাহেবের লিখনীতে সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

প্রথম মুদ্রণে বইটিতে ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে এ আশা রেখেই আপাতত শেষ করছি।

প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচি পত্র

উনিশ'শ উনসত্তরের গণ আন্দোলন / ৯
উনিশ'শ সত্তরের নির্বাচন ও সামরিক ষড়যন্ত্র / ১৭
মুক্তি সংগ্রামে চট্টগ্রাম / ২৩
মেজর জিয়ার ঘোষণা / ৩৯
মুক্তিবাহিনী গঠনপ্রক্রিয়া শুরু / ৪১
মুজিব বাহিনী গঠন / ৪৬
মুজিব বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনা / ৫২
ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং মুজিব বাহিনী / ৫৮
শেখ মুজিবুর রহমান 'র'- 'সিআই'এর মুখোমুখি / ৬৭
মুক্তিযুদ্ধের মোড় পরিবর্তন / ৭৬
জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধ পরিকল্পনায় নতুন মোড় / ৭৭
যুদ্ধাভিযানে জেড ফোর্স / ৭৮
যুদ্ধাভিযানে 'কে' ফোর্স / ৮৪
যুদ্ধাভিযানে 'এস' ফোর্স / ৯২
চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ / ১০২
জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণ / ১২৪
বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনাবলি / ১৩৮
ময়নামতি ক্যান্টনলমেন্টে আগুন / ১৩৮
অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া / ১৪২
১৯৭১ সালে কয়েকজন শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় / ১৫১
ডা ঃ ফজলে রাব্বি /১৫১
আবুল কালাম শামসুদ্দীন / ১৫৩
সিরাজুদ্দীন হোসেন / ১৫৫
বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান / ১৫৭

www.pathagar.com

উনিশ'শ উনসত্তরের গণ আন্দোলন

উনিশশত উনসত্তর সালে পাকিস্তানে গণ আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি ছিলেন চীনপন্থী। ১৯৬৮ সালে ২৮ নভেম্বর কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের যৌথ সভায় ৬ ডিসেম্বরকে 'জুলুম প্রতিরোধ' দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ঐ দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। যদি পাকিস্তান সরকার এ দাবি মেনে না নেয় তবে স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠন করারও ঘোষণা দেওয়া হয়। পল্টন ময়দানের জনসভার পরের দিন পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল ডাকা হয়। হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে তিনজন নিরীহ লোক মারা যায়। তখন থেকেই গণ আন্দোলন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। আস্তে আস্তে এ আন্দোলন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত সে সময়ে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল যেমন জামায়াতে ইসলামী ও নেদায়ে ইসলাম, আর মধ্যপন্থী দল যেমন আওয়ামীলীগ, বামপন্থী দল যেমন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এ গণ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এ সকল দল মিলে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি সংক্ষেপে ডাক গঠন করে। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির সাথে আরো যোগ দেয় পিপলস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট। পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পাকিস্তান জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

১৯৬৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর আওয়ামীলীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণ আন্দোলন শুরু করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা এ গণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপ প্রচার চালাচ্ছে। তারা আওয়ামীলীগের সাথে একত্রে আন্দোলনে অনীহা প্রকাশ করছে। বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ করা সত্ত্বেও আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা ভাসানী তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বামপন্থী ও ডানপন্থী দলগুলো নিয়ে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি গঠন করেন।

www.pathagar.com

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে উঠা গণ আন্দোলনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি দক্ষিণপন্থী দলগুলো। এর সাথে মস্কোপন্থী দলগুলোও খুব বেশি খুশি হতে পারে নি। যদিও অনেক বামপন্থীদল মাওলানা ভাসানীকে কটাক্ষপূর্ণ কথা বলতে থাকে তবু আন্দোলন ছাড়া তাদের আর কোন পথ খোলা থাকে না। এর মধ্যে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগার দফা দাবি পেশ করে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। এ কারণেই পরিস্থিতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মস্কোপন্থী দল আওয়ালী লীগ ও ডানপন্থী দলগুলো মিলে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি গঠন করে যাকে সংক্ষেপে ডাক বলা হত। আন্দোলনে আওয়ামীলীগ যে সমস্ত প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায়। সেগুলো হল সার্বজনীন ভোটাধিকার, ফেডারেল পদ্ধতির সংসদীয় ব্যবস্থা, শেখ মুজিবুর রহমান, ওয়ালী খান, জুলফিকার আলা ভুট্টোসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী জানায় এবং ট্রাইবুনালে সকল মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন। এ দাবী ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটিতে পাশ হয়। তখন পর্যন্ত আওয়ামীলীগের ছয় দফা দাবীর মধ্যে স্বাধীনতার কোন প্রস্তাব প্রকাশ পায় নি। ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির প্রস্তাবেও স্বাধীনতার কোন কথা ছিলনা।

১৯৬৮ সালে ৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে যে আইয়ূব খান বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়; এর একমাস দুদিনের মাথায় সমস্ত দলগুলোর মিলিত আন্দোলন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত রূপ ধারণ করে। এ আন্দোলন শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও গণ আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনের সূচনা করেন মূলত জুলফিকার আলী ভুটো তাশখন্দ চুক্তিকে পুঁজি করে।

১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী এককভাবে প্রায় একমাস যে গণ আন্দোলনের রূপ দেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সে আন্দোলনের তোড়ে কেঁপে উঠলো আইয়ূব খান সাহেবের দশ বছরের লৌহ মানবের শাক্তিশালী শাসন। তখন তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে আগড়তলা মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হল। ১৯৬৯ সালের ২২ জানুয়ারী শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন। আগরতলা মামলা স্থগিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আইয়ূব খানকেও বিদায়

www.pathagar.com

নিতে হয়। ১৯৬৯ সালে ২৬ মার্চ পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান।

মাওলানা ভাসানীর দলের কিছু লোক ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। তারই দল থেকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার ঘোষণা দেয় এ বাতাস আওয়ামী লীগ পন্থী ছাত্রলীগের মধ্যেও লাগতে থাকে ফলে তাদের মধ্যেও স্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হতে থাকে। এসময় থেকেই ভাসানীর দলের মধ্য থেকে একদল স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রাখতে থাকে। তখন জাতীয়তাবাদী তরুন দল এ স্বাধীনতার পক্ষে শ্লোগান দিতে থাকে।

মাওলানা ভাসানী ১৯৬৯ সালের ৬ ডিসেম্বর পল্টনের জনসভায় স্বাধীন পর্ব বাংলার ঘোষণা দিলেও তার পাঁচ দিন পূর্বে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির শ্রমিক সংগঠন স্বাধীনতার আহ্বান করে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (চীন) অভ্যন্তরে কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি 'স্বাধীন পূর্ববাংলার' কর্মসূচীর প্রচার পত্র বিলি করে ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে। ঐ প্রচার পত্রে বলা হয় সাম্রারাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির প্রতিভু এক কেন্দীক স্বৈরচারী সমরবাদী শাসকগোষ্ঠীকে পূর্ব বাংলার বুক থেকে উচ্ছেদ করে একমাত্র স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা গঠনের মাধ্যমে শোষিত মানুষের মুক্তি আসবে।

দিনে দিনে স্বাধীনতার শ্লোগান উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ক্ষমতায় এসে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওয়াদা করেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর এক বেতার ও টিভি ভাষণে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। কিন্তু নির্বাচনের আগে এক প্রলয়ংকরী বন্যায় বিপর্যস্ত করে দেয় পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবন। সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। মাওলানা ভাসানীর দলসহ সকল রাজনৈতিকদল নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। কিন্তু মাওলানা ভাসানী তার দলের অভ্যন্তর থেকে প্রচুর চাপের সম্মুখীন হন। তারা নির্বাচন বয়কটের দাবি জানাতে থাকে। বামপন্থীরা তাকে এ বলে চাপ সৃষ্টি করে যে, ভোটের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের

www.pathagar.com

ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। বরং সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে এ পরিবর্তন আনতে হবে। এ লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৭০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগার দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননের সাত বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আওয়ামীলীগ ছয় দফা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রলীগের ছেলেরা নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে পড়ে। এর মধ্যে পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগের বেশিরভাগ কর্মী স্বাধীন পূর্ব বাংলা বিপ্লবী পরিষদে যোগ দেয়। নির্বাচনী প্রচারকে তারা জনগণের দোর গোড়ায় নিজেদেরকে নিয়ে যাবার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। ছয় দফার আড়ালে এক দফার সংগ্রাম অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জোরদার করার কাজে নেমে পড়ে। সে বছরই অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের তিন নেতা সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমদ তাদের ছয় বছরের গোপন তৎপরতায় অর্জিত সাফল্যের প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে নেমে যায়।

১৯৬৯ সালের ১৫ ফ্রেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দী থাকা অবস্থায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ১৯৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যু বাষিকী পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব পড়ে ছাত্রলীগের একাংশের উপর। এ অংশের নেতৃত্বে ছিলেন স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী পরিষদের নেতৃবৃন্দ। ছাত্ররা মার্চ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মার্চ মিছিলের নামকরণ করা হয় ১৫ ফেব্রুয়ারী বাহিনী।

এ সময় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল নূরে আলম সিদ্দিকী। তাকে ১৫ ফেব্রুয়ারী বাহিনী এবং মার্চ মিছিল সম্পর্কে কিছুই জানানো হয় না আরো অজানা থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহসভাপতি আ. স. ম. আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন। সে সময় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শাহজাহান সিরাজ। তাকে এ ব্যাপারে জানানো হয়। সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী মার্চ মিছিলে ১৫ ফেব্রুয়ারী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন তৎকালীন নগর ছাত্রলীগ সভাপতি মুজিবর রহমান। তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতৃ শেখ হাসিনাও এ মার্চ মিছিলে যোগদান করেন। এ

www.pathagar.com

মিছিলে শেখ হাসিনাকে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো যাতে শেখ মুজিবুর রহমান এতে সমর্থন দেয়। এ ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান কোন মন্তব্য করেন নি।

আসলে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নেতৃবন্দ। আর শেখ মুজিবুর রহমানকে অস্বীকার করেও আন্দোলন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের নেতৃবৃন্দ আরো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পক্ষে মত দিবেন না। তার এ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে। কাজেই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ এককভাবে আত্মপ্রকাশ করার সাহস পায় নি। তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোপনীয় ভাবে কাজ করে তারা। এ কারণেই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সংবাদ পায় না পাকিস্তানের কেন্দীয় গোয়েন্দা সংস্থা। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ও এ সংবাদ গোপন ছিল।

১৯৭০ সালের ৭ জুন ছয় দফা দিবসকে সামনে রেখে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নতুন বাহিনী গঠনের তৎপরতা শুরু করে এবং অধিকতর সংগ্রাম চেতনায় সৃষ্ট একটি বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ বাহিনীর নামকরণ করা হয় জয়বাংলা বাহিনী। এদিনেই আওয়ামীলীগের শ্রমিক সংগঠন শ্রমিকলীগ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিবাদন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ছাত্রলীগের মধ্যমে তাকে গার্ড অব অনার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ ছাত্রলীগের নেতৃত্ব প্রায় দখল করে নেয়। ডাকসুর সহসভাপতি ও ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক স্বাধীনতার প্রেরণায় সিক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্বে এসে যায়। সিদ্ধান্ত হয় যে, জয়বাংলা বাহিনী ৭ জুন শহীদ মিনার থেকে পূর্ণ সামরিক কায়দায় পল্টন ময়দানে যাবে। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিভাদন জানাবে। ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছেন; কাজেই এ দুজনকে পল্টন ময়দানে অভিভাদন দেওয়া হবে শেখ মুজিবুর রহমানকে এ কথা জানায় নি।

৭ জুনকে সামনে রেখে জয়বাংলা বাহিনী গঠন, মার্চ মিছিল সংক্রান্ত ব্যাপারটি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবহিত করা হয়। তার হাতে যে

www.pathagar.com

জয়বাংলার পতাকা তুলে দেয়া হবে এ সম্পর্কে কিছুই জানান হয় নি। এ পতাকাটি ছিল হঠাৎ একটা সিদ্ধান্তের ফসল।

৬ জুন রাতে ইকবাল হলের ১১৮ নং রুমে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। এ সভায় শাহজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আব্দুর রব ও মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন এরা ছিলেন, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্য। উক্ত সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে পতাকা প্রদান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পতাকা কেমন হবে এবং তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করা হয়। সবুজের ভেতর লাল সূর্য হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতীক। লাল বর্ণ সূর্যের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র বসিয়ে দেয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয় এ আন্দোলনের সাথে পশ্চিম বাংলা কিংবা ভারতের সাথে কোন যোগসূত্র নেই। অথবা মুক্ত বাংলা আন্দোলনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। হাসানুল হক ইনু ছিল এসময় পাশের রুমে। তাকে ডেকে আনা হয়। তার উপর পতাকার ডিজাইন তৈরি এবং তা বানিয়ে আমার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কুমিল্লার ছাত্রলীগ নেতা শিবনারায়ন দাস এদিন এ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিল। সে আবার আর্ট করতে পারত। হাসানুল হক ইনু শিবনারায়নের সাহায্য চান। তিনি সাদা কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে একটি ডিজাইন তৈরি করে। এর পরে দর্জির কাছে যাওয়া হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় অফিস তখন বলাকা ভবনে পাশের রুমে অবস্থিত ছিল নিউ পাক ফ্যাশন টেইলার্স। দোকানের ম্যানেজার নাসির উল্লাহর সাথে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের ভাল সম্পর্ক ছিল। দোকানের মালিক ছিলেন নাসির উল্লাহর ভগ্নিপতি মোহাম্মদ হাশেম। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তারা পশ্চিম বাংলার কলকাতা থেকে চলে আসেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায়। এ নিউ পাক ফ্যাশন টেইলার্স থেকেই তৈরি হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা।

স্বাধীন বাংলা পতাকা তৈরির ব্যাপারে হাসানুল হক ইনু এবং শিবনারায়ন দাস রাত সাড়ে দশটায় নিউ পাক ফ্যাশন টেইলার্সে যায়। তখন দোকানের মালিক ও অন্যান্য কর্মচারীরা সব চলে গেছে। হাসানুল হক ইনু ও শিবনারায়ন দাস কাগজের উপর আকা পতাকার একটি নক্সা দেখিয়ে দেয়। রাত বারটার পর পতাকার কাজ শুরু হয়। মেইন গেটে তালা লাগানো ছিল কাজেই কেউই দেখার কোন ব্যাপার ছিল না। রাত চারটার দিকে পতাকা তৈরির কাজ শেষ হয়।

www.pathagar.com

৭ জুন জয়বাংলা বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্চ মিছিল করে যায় পল্টন ময়দানে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন আ.স.ম আব্দুর রব ও হাসানুল হক ইনু। আ.স.ম আব্দুর রবের হাতে ছিল জয় বাংলা বাহিনীর পতাকা। এ পতাকা ছিল পেচানো অবস্থায়। পল্টন ময়দানে অভিবাদন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার দুপাশে ছিল কয়েকজন নেতৃবৃন্দ। মার্চ মিছিল অভিবাদন মঞ্চের কাছে পৌছলে আ. স. ম. আব্দুর রব গোটানো পতাকাটি হাঁটু গেড়ে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে দেন। শেখ মুজিবুর রহমান তা গ্রহণ করে কিছুটা খুলে আবার আ,স,ম আব্দুর রবের হাতে ফেরত দেন।

৭ জুনের পর ঢাকা নগর ছাত্রলীগের বিভিন্ন শাখায় মার্চ মিছিলের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রথম মার্চ মিছিলটি করার কথা ছিল ঢাকা কলেজে। এ মিছিলের জন্য জয়বাংলা বাহিনীর পতাকাটি হাসানুল হক ইনুর কাছ থেকে নিয়ে আসেন তৎকালীন ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুহামদ জাহিদ হোসেন। ছাত্রলীগের মধ্যে তখন দুটি গ্রুপ তৈরি হয় একটি স্বাধীনতার পক্ষে অপরটি স্বাধীনতার বিপক্ষে। ছাতলীগের ভাঙ্গন রোধে মার্চ মিছিলের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। জয়বাংলা বাহিনীর পতাকা থেকে যায় মোঃ জাহিদ হোসেনের কাছে।

৭ জুন মার্চ মিছিলের পর স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ স্বাধীনতার প্রশ্নে আরো বেশি আপোসহীন হয়ে পড়ে এবং আওয়ামীলীগ নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করায়। ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া সম্পর্কিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার তিন দিন পূর্বে ১৯৭০ সাওলর ২২ আগস্ট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেয়। এ দিন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বিপ্লবী পরিষদ স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠন করার প্রস্তাব করে। তৎকালীন চট্টগ্রাম ছাত্রলীগ নেতা ও ছাত্রলীগ প্রচার সম্পাদক স্বপন চৌধুরী কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব উত্থাপন করে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য সংখ্যা ৪৫ জন। এর মধ্যে ছত্রিশ জন ছিলেন বিপ্লবী পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত। এরা সবাই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে বাকী নয়জনের মধ্যে ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন। শেখ শহীদুল ইসলাম এর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এরা ছিল শেখ ফজলুল হক মনির অনুসারী।

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী যখন দেখলেন বিপুল ভোটে এ প্রস্তাব পাশ হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি সভা থেকে বের হয়ে যান এবং চলে যান সরাসরি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে, যাতে এ প্রস্তাব পাশ না হয়। নূরে আলম সিদ্দিকী আর সভাকক্ষে ফিরে আসেন নি। সভাপতির অনুপস্থিতিতে মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয় এবং স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি যখন স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রস্তাব গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে সময় বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম সদস্য আব্দুর রাজ্জাকের মারফত শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাবের প্রতি তার আপত্তির কথা জানিয়ে দেন। তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণকারীদের প্রতি রীতিমত রুষ্ট হয়ে উঠেন। আসলে শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন এ ধরনের কোন প্রস্তাব যাতে না আসে।

১২ আগস্ট ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব পাশ হওয়ায় আওয়ামীলীগ বেকায়দায় পড়ে যায়। তাদের শক্তির অন্যতম উৎস হল ছাত্রলীগ। তখন এ ছাত্রলীগ দুভাগ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

উনিশ'শ সত্তরের নির্বাচন ও সামরিক ষড়যন্ত্র

৫ অক্টোবর থেকে ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন পিছিয়ে গেলে আওয়ামীলীগ নির্বাচনী প্রচারণার জন্য আরো সময় পেল। ছাত্রলীগের একটি অংশ যারা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফায় বিশ্বাসী তারা নির্বাচনী অভিযানে নেমে পড়ে আর সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের পক্ষের অংশ এ সুযোগ গ্রহণ করে। এ অবস্থা আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের জন্য, যারা নির্বাচন বিজয়ের পক্ষে ছিলেন এক প্রকার নিশ্চিত এবং নির্বাচনের পর পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় বসার স্বপ্ন দেখছিলেন। তাদের জন্য তৈরি হয় এক নাজুক অবস্থা। মাওলানা ভাসানীর দলের ভিতকার বামপন্থীরা আওয়ামী লীগের জন্য বিপদজনক অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭০ সালের ২ অক্টোবর পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়ন এক প্রচার পত্র বিলি করে। তাতে ছিল শাসক গোষ্ঠী ও সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলুন শ্রেণী সংগ্রাম। সৃষ্টি করুন সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিকণা। যারা প্রতিষ্ঠিত করবে শোষণহীন এক নতুন রাষ্ট্র, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে প্রায় সমান তালে এগিয়ে যায়। অপরদিকে আওয়ামীলীগসহ অন্যান্য দল ৭ ডিসেম্বরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নির্বাচনী প্রচারণাকে জোরদার করতে চেষ্টা করতে থাকে। মাওলানা ভাসানী নির্বাচনে মনোনয়নও দেয়। কিন্তু নির্বাচন তারিখের চব্বিশ দিন পূর্বে ১২ নভেম্বর ১৯৭০ সালে দক্ষিণ বাংলার ওপর দিয়ে বয়ে যায় এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় বিস্তীর্ণ জনপদ। প্রাণ হারায় প্রায় তিন লাখ মানুষ। লক্ষ লক্ষ নরনারী সম্পদহীন হয়ে যায়। সারা বিশ্বের মানুষ ছুটে আসে আর্ত মানবতার সেবায় অথচ পাকিস্তান সরকার প্রদর্শন করে চরম উদাসীনতা। দুর্গত মানুষের প্রতি কিছুমাত্র সাহানূভূতি প্রকাশ করেনা। কোন সাহায্যও পাঠায় না। সরকারের এ অমানবিক আচরণে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। মাওলানা ভাসানী সরকারের এ হৃদয়হীন আচরণের জবাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়ে এক প্রচার পত্র বিলি করেন। তিনি প্রচার পত্রে বলেন, আজ থেকে ১৩ বছর পূর্বেই ষড়যন্ত্র, অত্যাচার শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ থেকে

www.pathagar.com

মুক্তিলাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আসসালামু আলাইকুম বলেছিলাম। হয়তো বাঙালী সেদিন নাটকের সব কটি অঙ্ক বুঝে উঠতে পারে নি। আমি আশা করি, শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন বাঙালীকে বুঝাতে হবে না যে মানবতা বর্জিত সম্পর্কে মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে। এবার নেমেসিমের শাস্তি বিধানের অপেক্ষায় আমরা আছি। অপর দিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষিতে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি উঠতে থাকে। কিন্তু সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান তার সিদ্ধান্তে অটল। এর ফলে মাওলানা ভাসানী নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেন। ইয়াহিয়া খান ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের দেখতে আসেন নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। যখন তার আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ সফরে তার সফর সঙ্গী ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান আবদুল হামিদ খান।

ইয়াহিয়া খান ঢাকায় অবস্থানকালে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তিনটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াহিয়া খানের যোগাযোগ মন্ত্রী জি. ডব্লিউ চৌধুরী বলেন, এ বৈঠকের পরিবেশ ছিল নভেম্বরে হালকা শীতের আমেজ। বৈঠক শেষ হওয়ার পর ইয়াহিয়া জি. ডব্লিউ চৌধুরীকে ডেকে পাঠান। বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে তাকে আনন্দের সাথে বলেন, নির্বাচন স্থগিত না করার সিদ্ধান্ত সঠিক ও দূরদর্শী। কাজেই নির্বাচন ৭ ডিসেম্বর তারিখেই হবে।

ঘূর্ণিঝড় ও দুর্গতদের দেখা ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে গোপন বৈঠক শেষে ৩ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে রাওয়াল পিণ্ডি চলে যান। কিন্তু ইতোমধ্যে শাসন ক্ষমতার রদ বদল হয়ে যায়। ঢাকায় তার অবস্থান কানেই শুজব রটে যে, ইয়াহিয়া খানের হাতে আর ক্ষমতা নেই। চিফ অপ স্টাফ আবদুল হামিদ খান ঢাকাতে প্রেসিডেন্টর সফর সঙ্গী হয়ে এসে ও তারই নেতৃত্বে সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করেছে। ইয়াহিয়া খান এখন কার্য সামরিক জান্তার হাতের পুতুল। যদিও তিনি ৩ ডিসেম্বর করাচীগামী বিমানে আরোহন করার পূর্বে ঢাকা বিমান বন্দরে এক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এ গুজবকে অস্বীকার করেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা রাও ফরমান আলীর ভাষ্যে গুজবের সত্যাতা প্রমাণ হয়।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে তাকে অবগত করাতে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট

www.pathagar.com

জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং জেনারেল অফিসার কামান্ডিং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ১ মার্চ রাতে পিণ্ডি রওয়ানা হয়ে যান। ৩ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেন। প্রেসিডেন্ট হাউজের নাউঞ্জের পা দিতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে তিনি হতবাক হয়ে যান। তার ভাষায় অপরদিন বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্ট হাউজে ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা হল। লাউঞ্জে বসে জেনারেল হামিদ মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং প্রেসিডেন্ট, এ তিন জনে একত্রে মদপান করছেন। সামনের টেবিলে ইয়াহিয়া খান ও হামিদ দুজনে পা তুলে বসেছিলেন। এ দৃশ্যই বলে দেয় নির্বাচনের পূর্ব থেকেই ইয়াহিয়াকে ক্ষমতা হারিয়ে প্রায় পুতুল হয়ে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে থাকতে হয়। সামরিক জান্তা যেভাবেই চায় তাকে তখন সেভাবেই চলতে হয়। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব গুজব বিশ্বাস করে নি বলেই নির্বাচনের পর তারা ইয়াহিয়াকে আশ্বাস দেন যে, ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাকেই তারা প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাখবেন। তাই হামলা হবে জানতে পেরেও শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের উপর ভরসা করেই ১৯৭১ সালের মার্চের আলোচনা চালিয়ে যান। অপর দিকে নির্বাচনে বিজয়ী হলেও আওয়ামীলীগের হাতে তথা বাঙালীর কাছে পাকিস্তানের ক্ষমতা তুলে দেবেন না সামরিক জান্তা একথা মাওলানা ভাসানী জানতেন। তাই নির্বাচনের দুদিন আগে ৫ ডিসেম্বর পল্টনের এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মুজিব, তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দাও। যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার স্বার্থে কাজ কর তাহলে আওয়ামীলীগের কবর ৭০ সালেই অনিবার্য হয়ে যাবে।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সামরিক জান্তাকে চিন্তিত করে দেয়। সামরিক জান্তার হিসেব ছিল কোন দলই জাতীয় পারিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। কাজেই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে। মূলত ক্ষমতা থাকবে সামরিক বাহিনীর হাতে। সামরিক জান্তা এ হিসেব করে তার নিজস্ব গোয়েন্দা সূত্র প্রস্তুতকৃত তথ্য থেকে। নির্বাচনের পূর্বে দলগত অবস্থান সম্পর্কে ঐ গোয়েন্দা রিপোর্ট কোন দল কতটা আসন পেতে পারে তা তুলে ধরে এভাবে, আওয়ামীলীগ ৮০, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) ৭০, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৪০,

www.pathagar.com

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৩৫, পাকিস্তান পিপলস পাটি ২৫। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পেয়ে যাবে আওয়ামীলীগ আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের ৮৮টি পেতে পারে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি, এ ধারণা সামরিক শাসকের কল্পনাতেও আসে নি। আওয়ামীলীগের ১৬০টি আসনের সাথে যুক্ত হবে মহিলাদের ৭টি আসন। অতএব জাতীয় পরিষদে আওয়ামীলীগের আসন হবে ১৬৭ টি। নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন হল আওয়ামীলীগের। আর পশ্চিম পাকিস্তানে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্ম প্রকাশ করল জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পাটি।

আওয়ামীলীগের বিপুল বিজয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পায়তারা শুরু হল। পাকিস্তানের সামরিক শাসক পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বেছে নেয়। ভুট্টোও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। কাজেই সামরিক জান্তা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করে। ভুট্টো তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া তিনি প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। জুলফিকার আলী ভুট্টোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান ও তেহরিফেক ইশতিকলাল পার্টির সভাপতি আজগর খান তার লিখিত জেনারেল ইন পলেটিক্স বইতে। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইয়াহিয়া খানকে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান কোন সমস্যা নয়। বিশ হাজারের মত লোক মারতে হবে তাতে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে না তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ২০ ডিসেম্বর লাহোরের জনসভায় ভুট্টোর ভাষণে। জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, পাকিস্তান পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় আসনে বসতে রাজী নয়। ভুট্টোর এ মন্তব্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সারা পূর্ব পাকিস্তান। এর প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারী রমণা রেসকোর্স ময়দানে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুত নির্বাচন সুসম্পন্ন করায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তার (ইয়াহিয়ার) মধ্যে একটি অংশ সক্রিয় যারা এখনো নির্বাচনী ফলাফলকে উল্টে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়ার যে অধস্তনদের ইঙ্গিত করেন

www.pathagar.com

তাদের নিয়েই গঠিত ছিল সামরিক জান্তা। সামরিক জান্তার সদস্য ছিলেন, জেনারেল আব্দুল হামিদ খান সেনাবাহিনীর চীপ অব স্টাফ; নেফটেন্যান্ট জেনারেল গুণ হাসান, চীপ অব জেনারেল ষ্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। কোর কামান্ডার, মেজর জেনারেল ওমর, চেয়ারম্যান জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি, মেজর জেনারেল আকবর খান, পরিচালক আন্ত সার্ভিস গোয়েন্দা সংস্থা। এ ছাড়া দুজন বেসামরিক ব্যক্তিকেও রাখা হয় এ সামরিক জান্তায়। এরা হলেন প্রেসিডেন্টের অর্থনেতিক উপদেস্টা এম. এম. আহমদ, ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক এল, এ রিজভী। বেসামরিক এ দু ব্যক্তি ইয়াহিয়া খানের একান্ত অনুগত ও বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর ২০ ডিসেম্বরের ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। জটিলতা নিরসনে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্য ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারী ঢাকায় আগমন করেন। ঐ দিন তিন ঘন্টাব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শুধু তার ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে। এ বৈঠকেই শেখ মুজিবুর রহমান সরকার গঠনের পর তাকে প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাব দেন। মোহাম্মদ আজগর খান তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আলোচনার এক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়াকে বলেন যে, নতুন শাসনতন্ত্র রচনার পর তারা তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেতে চান। এ প্রস্তাবে ইয়াহিয়া খান বিস্মিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কেন আপনারা আমাকে প্রেসিডেন্ট করতে চান? শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাখ্যা দেন যে, তিনি এবং তার দল মনে করে এটাই হবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দুবছরের অভিজ্ঞতা এবং সেনাবাহিনীতে তার অবস্থানকে সুবিধা হিসেবে কাজে লাগান যাবে এবং শেখ মুজিবুর রহমান অনুরোধ করেন প্রস্তাবটি ইয়াহিয়া খানকে গ্রহণ করতে। ইয়াহিয়া খানকে রাজি করাতে বেশি বেগ পেতে হল না। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। একদিন পর ১৪ জানুয়ারী রাওয়াল পিন্ডির সাথে করাচীগামী বিমানে ওঠার আগে তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া খান বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান দেশের ভবিষ্যত প্রধান মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে পা দিতেই পরিস্থিতি তার জন্যে আরো জঠিল হয়ে গেল। চাপ বৃদ্ধি পায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর পক্ষ থেকে। এবং সামরিক জান্তাও চাপ দিতে থাকে। ১৭ জানুয়ারী জুলফিকার আলী ভুট্টোর

www.pathagar.com

লারকানার বাড়ীতে গিয়ে আরো চাপের সম্মুখীন হন। ভুট্টোর আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানে আরো গিয়েছিলেন সামরিক জান্তার সদস্য জেনারেল হামিদ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদাসহ আরো কয়েকজন। লারকানায় গোপন বৈঠকের পর হতে যে ক্ষমতা ছিল সত্ত ইয়াহিয়াকে ছেড়ে দিতে হল। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায় যে, ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব। কার্যক্রমই বা কিভাবে হবে? সাধারণ পুলিশ দিয়ে বাঙালীকে দমন করা সম্ভব হবে না। বিকল্প হচ্ছে সামরিক বাহিনী দিয়ে হামলা করা। নিরঙ্কুশ বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার পরিবর্তে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশ্বে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। প্রতিবেশী দেশ ভারত, সে আসলে শত্রু ভাবাপন্ন। এ ব্যাপারে ভারত কি ভূমিকা নিতে পারে সে ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু বুঝা যায় না বরং তা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। সামরিক জান্তা এ কথা বুঝতে পারে যে, ভারত এ সুযোগ হাত ছাড়া করবে না। তাতে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে যা সামরিক জান্তার পক্ষে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। তাই হামলা প্রস্তুতি ও আক্রমণ পরিচালনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন কিন্তু মার্কিন প্রশাসন ভুট্টো ও সামরিক জান্তার দিক থেকে ফিরে গেল।

ঢাকায় সে সময়ের মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাড ১৯৭১ সালের মার্চে ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কয়েকদিন পর সরাসরি ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট পাঠান যে পূর্ব বাংলার মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে রয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর না হলে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধে যাবে। ২৫ মার্চ সামরিক জান্তার হামলার বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসনের উদাশীনতার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আর্চার কে ব্লাড এবং তার অধস্তনদের স্বাক্ষর এক প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন ওয়াশিংটনে। এতে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর তাকে আতঙ্ক বাতিকগ্রস্ত বলে অভিহিত করে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠান।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলার উপর দিয়ে যে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছস বয়ে যায়। জোসেফ ফারন্যান্ড তার উপর ওয়াশিংটনে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তা হল, বিপর্যয়ে যতটা জীবনহানি হয়েছে, বাঙালীরা তার অতিরঞ্জন করেছে রাজনৈতিক কারণে। জোসেফ ফারন্যান্ড শেখ

www.pathagar.com

মুজিবর রহমানকে ভাল ভাবে জানতেন এবং তাকে প্রাণবন্তু ও প্রাণ প্রাচুর্যসম্পন্ন দেখতে পান কিন্তু তিনি গালভরা বুলি আওরাতে ভালবাসেন। যারা বুলি কপচায় তারা সাধারণত কারো বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না। আর তিনি যদি আকাশ ছোয়া জনপ্রিয়তার অধিকারী হন সকল নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া তার পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে।

অতএব মার্কিন প্রশাসন আর্চার কে ব্লাডের রিপোর্ট বিশ্বাস না করে জোসেফ ম্যারন্যান্ডের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর প্রত্যাশাকে পূরণ করেন। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন নিক্সন।

সিনেটর উইলিয়াম ব্যান্ডস বলেন– Next thing kisinger had a great deal of sympathy for Yahya khan because he was the first Pakistani leader to hold free elections and there fore. I feel that shcikh Mujibur Rahman should meet him at least half a way. Moreover. I dont think they expected him to resoxt to a compaign of terror in East Pakistan; I think they expected that he would take sharp quick military action and that would be suffecient as have been at the past to put dowr rise in East Pakistan.

(ইয়াহিয়ার প্রতি কিসিঞ্জার প্রভূত সহানুভূতিশীল ছিলেন। কারণ ইয়াহিয়া খান হচ্ছেন প্রথম পাকিস্তানী নেতা। যিনি সর্বপ্রথম অবাধ সাধারণ নির্বাচন দেন। অতএব এ ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানকে আরো কিছু দূর অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। উপরন্তু আমি মনে করি না তারা এটা মনে করেছিল যে, ইয়াহিয়া সন্ত্রাসের আশ্রয় নিবেন। আমি মনে করি তারা অর্থাৎ মার্কিন প্রশাসন আশা করেছিল যে, ইয়াহিয়া একটি ত্বরিত সামারিক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। যা অতীতে পূর্ব পাকিস্তানে অভ্যুত্থান দমনে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

আমেরিকার সিনেটর উইলিয়াম ব্রান্ডসের ভাষ্য অনুযায়ী তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন মনে করেছিল পুলিশী ধরনের সামরিক কার্যক্রমে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন হয়ে যাবে। ভারতের 'র' এর পরিকল্পনা হয়ে যাবে ব্যর্থ। তার ছয় দফাকে পাশ কাটিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে অখণ্ড

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা যাবে। এ ধরনেরই ধারণা ছিল ইয়াহিয়া খানের, সামরিক জান্তার এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর। কিন্তু তাদের কারো মাথায় এ কল্পনা আসে নি যে, পুলিশী ধরনের সামরিক কার্যক্রম প্রচুর লোককে ভারতের আশ্রয় প্রার্থী করে দেবে। ফলে রুখে দাঁড়াবে পূর্ব পাকিস্তানের সমাস্ত জনগণ। তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিতেও ভুল করবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ সংকেত পেয়ে হামলা পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত করে সামরিক জান্তা। প্রস্তুতির জন্য সময়ের দরকার। এ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলতে হবে যাতে তারা বুঝতে না পারে যে, তাদের ওপর সামরিক অভিযান চালানো হবে। বিভ্রান্তির ঘোর কাটার পূর্বেই প্রস্তুতি শেষ করতে হবে। সামরিক জান্তা চিন্তা করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বিলম্বিত হলে তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্ধকারে রাখা যাবে না পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে। তাই তারা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৩ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে দিয়ে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু এর দুদিন আগে ১১ ফেব্রুয়ারী তারিখে এক গোপন বৈঠকে সামরিক জান্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানে হামলা পরিচালনা করবে।

১৯৭১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম ভাগে রাওয়াল পিণ্ডির সেনাসদর দফতরে সামরিক জান্তার একটি বৈঠক বসে। ২৫ মার্চের হামলা পরিচালনা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল হামিদ খান লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল ওমর, মেজর জেনারেল আকবর ও পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান এন, এ রিজভী। অতিরিক্ত হাজির ছিলেন গোয়েন্দা সংস্থার উপ-প্রধান এস.এ সাঈদ। সে ছিল জান্তার বাইরে। তাকে ডেকে পাঠান হয়। বেলা তিনটার দিকে বৈঠক শেষ হয়। এ বৈঠকেই পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের পরিবর্তে আসবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। যিনি আইয়ুব খানের আসনে বেলুচিস্তানের গণ অভ্যুত্থান দমনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বেলু চিস্তানের কসাই বলে পরিচিত এ ব্যক্তিই পূর্ব পাকিস্তানের হামলা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হয়। গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস, এম আহসানকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। টিক্কা খান যথাক্রমে গভর্নর সামরিক

www.pathagar.com

আইন প্রশাসক ও পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ড প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। গভর্নর ভাইস এডমিরাল আহসান ও জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল তারা রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি একটু নমনীয় ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাদের এ নমনীয়তার কারণ হল জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে গুলশানের একটি বাড়ীতে তাদের মধ্যে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান বামপন্থীদের শেষ করার আশ্বাস দেন। এ ব্যাপারে জি. ডব্লিউ চৌধুরী যিনি পাকিস্তান সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান গর্ব করে বলেছেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীদের নির্মূল করবেন। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলার ব্যাপারটি শেখ মুজিবুর রহমান অবগত হন। এ খবর পেয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। সত্যতা যাচাই করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন।

পরদিন সকালে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রাদেশিক প্রধান এ. বি. এস সবদার আসেন তার ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়িতে। সফদারকে দেখে শেখ মুজিবুর রহমান উঠে দাঁড়াল এবং তাকে নিয়ে পাশের কামরায় যান। এ. বি. এম সবদার ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে এবং ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিড়াল এস, এম, আহসান ও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সাথে দুটো করে মোট চারটি বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এ চারটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গুলশানের একটি বাড়ীতে।

পাশের কামরায় গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সফদারকে বললেন, খুবই উদ্বেগের মধ্যে আছি। ক্ষমতা হস্তান্তের না করার পরিকল্পনা চলছে। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সাথে দেখা করে আসল ব্যাপারটা আমাকে অবহিত করুন।

এ বি এস সবদার ঐ দিনই সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সাথে যোগাযোগ করেন। পরদিন দশটার সময় দেওয়া হয়। তার কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্বেগের কথা শুনে জেনারেল ইয়াকুব খান বলেন যে, খবরের পেছনে কোন সত্যতা নেই। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাশ কাটিয়ে এখানে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, শেখ সাহেবকে গিয়ে বলুন। তিনি যেন উদ্বেগের মধ্যে না থাকেন যতক্ষণ আমি এখানে

www.pathagar.com

আছি পরিস্থিতি নতুন কোন মোড় নিলে অবশ্যই তাকে জানানো হবে। এ বি এস সফদার ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমানকে সাহেব জাদা ইয়াকুব খানের আশ্বাস বাণী শুনিয়ে দিলেন।

জেনারেল সাহেব জাদা ইয়াকুব খানের কথায় শেখ মুজিবুর রহমান আশ্বাস্ত হলেও দুদিন পর নিশ্চিত হয়ে যান যে, সামরিক হামলা অবশ্যই হবে। র তাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে। তিনি আরো নিশ্চিত হল ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ায়। তবু ইয়াহিয়া খানের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বাস ছিল। কারণ তখন পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখের কোন পরিবর্তন হয় নি।

পাকিস্তানের সামরিক জান্তার গোপন বৈঠকের সংবাদ পেয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র তৈরি হয়ে যায় শতাব্দীর সুযোগ এর সর্বোত্তম ব্যবহারে। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধের জন্যও র প্রাস্তুতি নিতে থাকে। হামলা পরিকল্পনা মোতাবেক ২৭ ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ পূর্ব পাকিস্তানের পাঠানোর কার্যক্রম শুরু হবার প্রায় একই সময় ভারত তার কাশ্মীরের নাদাহ এলাকা থেকে চতুর্থ মাউনটেইন ডিভিশন পশ্চিম বাংলায় সরিয়ে আনতে শুরু করে নির্বাচনের অজুহাত তুলে। এ সময় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ ছিল পশ্চিম বাংলার নির্বাচন। নির্বাচনের পূর্বে পশ্চিম বাংলায় দু ডিভিশন সৈন্য ছিল। সিকিম ভুটান সীমান্তে দুডিভিশন এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ছিল দু ডিভিশন সৈন্য। মোট ছয় ডিভিশন সৈন্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে ঘিরে। নির্বাচনের অজুহাত দেখিয়ে কাশ্মীর থেকে এক ডিভিশন সৈন্য পশ্চিম বাংলায় আনার কারণে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তা সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক কর্যক্রম পরিচালনা করণে ভারতের সাথে যুদ্ধ বাঁধবে এটা তারা প্রায় নিশ্চিত ছিল। কাশ্মীর থেকে চতুর্থ মাউনটেইন ডিভিশন পশ্চিম বাংলায় আনার কারণে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠলো। এখন শুধু পূর্ব পাকিস্তানই নয়; ভারতের সাথে যুদ্ধের জন্য আমেরিকার সবুজ সংকেতের প্রয়োজন হল। ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারত সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম সুযোগকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলার প্রস্তুতিতে দেরী হচ্ছে বিধায় সামরিক জান্তা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে দিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশণ স্থগিত ঘোষণা করাল। তখন শেখ মুজিবুর রহমান অন্য একটি

www.pathagar.com

তারিখ ঘোষণা করার জন্য ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর এস. এম. আহসান শেখ মুজিবুর রহমানকে গভর্নর হাউজে ডেকে পাঠান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করণের বিষটি জানাতে। গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা রাও ফরমান আলীও সেখানে উপস্থিত ছিল। গভর্নর সাহেবের কথায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, নিঃসন্দেহে আমাদের সাথে প্রতারণা করা হল। আমাদের পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে ফেলা হল। তখন শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আরো দুজন লোক ছিল তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একা রয়ে গেলেন ভিতরে। পরে বললেন, জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের নতুন আর একটি তারিখ যদি এ মাসেই ঘোষণা করা হয় তাহলে জনসাধারণকে শান্ত করা যাবে। আপনি দয়া করে পরবর্তী একটা তারিখ ঘোষণা করার জন্য বলুন।

শেখ মুজিবুর রহমান গভর্নর আহসানকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আর একটি তারিখ ঘোষনার কথা বলে স্থগিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের ক্রোধ দমনের জন্য ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তান সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেন ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে পরবর্তী কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হবে। কিন্তু ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণায় সারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ফুঁসে ওঠে। ঐ দিন সন্ধ্যায় বিপ্লবী পরিষদের ১০ সদস্যের একটি দল হামলা চালায় নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়িতে। রাজপথে নামিয়ে দেওয়া সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ঢাকায় কয়েকজন মারা যায়। ২ মার্চ অবতারণা হল অভূতপূর্ব ঘটনার। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থাগিত ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করে এক প্রতিবাদ সভার। সভায় বক্তৃতা করার কথা ছিল ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের। সভায় উপস্থিত ছিলেন আ. স. ম. আব্দুর রব নূরে আলম সিদ্দিকী শাহজাহান সিরাজ। আব্দুল কুদ্দুস মাখনসহ আরো কয়েকজন। সভা শুরু হয় নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে। মঞ্চ ছিল কলাভবনের অলিন্দের ছাদ। ডাকসুর সভাপতি আ. স. ম. আব্দুর রব যখন বক্তৃতা করছিলেন ঠিক সে সময় পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে একটি ছোট মিছিল সভায় প্রবেশ করে জাহিদ হোসেনের নেতৃত্বে। জাহিদ হোসেনের হাতে ছিল জয় বাংলা বাহিনী পতাকা।

এ পতাকা হাতে জাহিদ হোসেন মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলে সে পতাকাটি নেওয়ার জন্য নূরে আলম সিদ্দিকী সামনের দিকে ঝুকে পড়েন আবার আ. স. ম. আব্দুর রবও ঝুকে পড়ে পতাকা নেয়ার জন্য। জাহিদ

www.pathagar.com

হোসেন তখন আ. স. ম. আব্দুর রবের হাতে পতাকা তুলে দেন। আ. স. ম আব্দুর রবের হাতে পতাকা দেওয়ার কারণ হল জাহিদ হোসেন ছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কর্মী আর আ. স. ম. আব্দুর বর ছিল তার ছাত্র ফ্রন্টের নেতা এ কারণেই পতাকা তার হাতে দেওয়া হয়েছিল। আ. স. ম. আব্দুর রব পতাকা হাতে মঞ্চ থেকে নেমে আসল। তখনও সভার কাজ শেষ হয় নি। কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা দেওয়ার বাকী ছিল। আ. স. ম. আব্দুর রব পতাকা হাতে নেমে আসলে তার পিছনে বিরাট এক মিছিল যোগ হয়। সে সময় থেকেই এ পতাকাটি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

এ দিন বিকেল থেকে ঢাকা শহরের প্রায় প্রতিটি বাড়ীর ছাদে এ পতাকা উত্তোলিত হল। ঢাকা যেন জেগে উঠলো অদ্ভূত আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ হয়ে। এক ঐতিহাসিক লগ্ন সূচিত হল।

পরদিন ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে আয়োজিত ছাত্র জনসভায় ছাত্রলীগ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। আগের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাতাকাটি আনা হয়েছিল সেটাকেই বাংলা দেশের পতাকা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ২ মার্চ সিরাজ সিকদারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে শেখ মুজিবর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, আপনার ছয় দফার বাস্তবায়ন সম্ভব একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত স্বাধীন করে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। ১ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলসের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ১৭২ জন লোক প্রাণ হারায় এবং আহত হয় ৩৫৮ জন।

১৯৭১ সালের ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে ২৫ মার্চ। এ দিনই লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়, এবং এস. এম. আসানকে অপসারণ করা হয়। সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে সংবাদটি জানিয়ে দিলেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে বললেন, আমি খুব শীঘ্রই ঢাকায় আসছি এবং আপনার সাথে বিস্তারিত আলাপ করবো। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষা ও জনগণের প্রতি দেওয়া আপনার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করব। আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে যা আপনার ছয় দফার চেয়ে বেশি খুশি হবেন। পরদিন ঐতিহাসকি ৭ মার্চ রমণা রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভার শেখ মুজিবুর রহমান কি বলবেন তা রাতেই নির্ধারিত করা হয়।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান সন্ধ্যায় পাওয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে ছিলেন। তাই তুমুল বাক বিতণ্ডা শেষে বৈঠকে বক্তৃতার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে যায় স্বাধীনতা কামীদের পাশ কাটিয়ে। সেদিনের বৈঠকের বিষয় কাউকে জানতে দেওয়া হয় নি। সে বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন বিচ্ছিন্নতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান কিছুই পাবে না, রক্তপাত ও পীড়ন ব্যতীত। আওয়ামীলীগের ম্যান্ডেট স্বাধীনতার জন্য নয় স্বায়ত্বশাসনের জন্য।

৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ১. সামরিক আইন তুলে নিতে হবে, ২. ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, ৩. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। ৪. বাঙালী হত্যার কারণ খুঁছে বের করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এ দাবি যতদিন আদায় না হবে তত দিন অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান করলেন চাপ সৃষ্টির জন্যে। বক্তৃতায় তিনি এ কথাও বলেছিলেন এ বারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

রাওয়াল পিণ্ডি সেনা সদর দফতরে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের প্রতিক্রিয়া ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সদর দফতরে টেলিফোনে আলাপকালে একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা জানান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন, এ পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ।

৭ মার্চের শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণকে অভিনন্দন জানান পাকিস্তানের দক্ষিণ পন্থী দলগুলো। কাইয়ুম মুসলিমলীগ নেতা মিয়া মমতাজ খান দৌলতানা বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি খুবই যুক্তিসংগত এবং পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তার দাবি মানতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে বলেন, এভাবেই বর্তমান সংকট থেকে জাতির উত্তরণ ঘটা সম্ভব। পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিদ্দিক আহমদ বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের চারদফা দাবি মেনে নিয়ে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে মধ্যে দিয়ে বর্তমান সংকট নিরসন করা সম্ভব। ৪ মার্চ পাকিস্তান তেহরিকে ইশতেকলাল পার্টি প্রধান অবসর প্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আজগর খান বলেন, যদি এরপরও বর্তমান শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থনে আমি আন্দোলন

www.pathagar.com

শুরু করবো। তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং আওয়ামীলীগের ছয় দফার মধ্যে খারাপ কিছু নেই।

শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পাকিস্তানের দক্ষিণ পন্থী দলগুলো অভিনন্দন জানায় বটে কিন্তু এ ভাষণ ছয় দফা পন্থী ও এক দফাপন্থীদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়।

পরদিন ৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ স্বাধীনতার পক্ষে এক বিরাট পদক্ষেপ নেয়। এ দিন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এবং সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে শুধু ছাত্রলীগ ব্যবহার করা শুরু করে। এ দিন গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত এবং এ ধরনের যুদ্ধে ব্যবহার উপযোগী অস্ত্র বিষয়ক একটি বেনামী প্রচার সস্ত্র বিলি করা হয়। পরদিন ৯ মার্চ মাওলানা ভাসানী স্বাধীনতায় ডাক দিয়ে বলেন, আসুন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে কাজ করি। এ আন্দোলনকে আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের মরণপণ সংগ্রামে পরিণত করি। সত্যিকারের জাতীয় মুক্তির আর কোন পথ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পাটি (মনিসিংহ) মূলত স্বাধীনতার পক্ষে রাজি ছিল না।

স্বাধীনতাকামীরা যখন সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন আপোসের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর জুলফিকার আলী ভুট্টো ও সামরিক জান্তা হামলা প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার চেষ্টায় গতি সঞ্চার করছে। সামরিক জান্তাকে আরো সময় বৃদ্ধি করে দেওয়ার লক্ষ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো নতুন এক খেলায় মেতে উঠলেন। ১৮ মার্চ বলেন। পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ভার আওয়ামী লীগের হাতে এবং পশ্চিমে পাকিস্তানের শাসন ভার পাকিস্তান পিপলস পার্টির হাতে থাকবে। এ প্রস্তাবে অবস্থা আরো জটিল আকার ধারণ করল। সমঝোতা বৈঠকের নামে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখার জন্য সামরিক জান্তা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ১৫ মার্চ ঢাকায় পাঠায়। এর মধ্যে ঢাকায় আসেন সামরিক জান্তার অন্যতম সদস্য পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। তার হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করে গভর্নর এস. এম. আহসান খান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান বিদায় নিয়ে চলে যান। আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আসে সামরিক জান্তার সদস্য জেনারেল হামিদ খান। লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুণ হাসান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল

www.pathagar.com

এস. এম. জি পীরজাদা, মেজর জেনারেল ওমর, মেজর জেনারেল আকবর ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান এস. এ. রিজভী। এ ছাড়াও আসেন কমান্ডো বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মিঠ্ঠা খান। তার প্রতি দায়িত্ব দেওয়া হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করার।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠকে বসেন ১৬ মার্চ বেলা এগারটায়। এ বৈঠকে দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটি আপোস সমঝোতা হয়ে যায় পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে টিকিয়ে রেখেই। পরদিন ১৭ মার্চ দু পক্ষ মুখোমুখী হল নিজস্ব পরামর্শকদের নিয়ে এবং ২০ মার্চ এক প্রকার স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ১৬ মার্চের আপোস রক্ষার আলোকে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে আরো ছাড় দিতে রাজি এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তরে তিনি কমবেশি প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। ইয়াহিয়া খান এ ছাড় দেওয়াতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে সামরিক জান্তা। তাকে শতর্ক করে দেওয়া হয় যে, তিনি অতিমাত্রায় ছাড় দিচ্ছেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড় দেওয়া নিয়ে ইয়াহিয়া খানকে দেওয়া সামরিক জান্তার সতর্কবাণী সম্পর্কে রাওয়াল পিণ্ডি প্রধান সামরিক আইন প্রসাসক দফতরে আইন বিশেষজ্ঞ এবং প্রেসিডেন্টের পরামর্শক দলের চতুর্থ ব্যক্তি কর্নেল হাসান জি. ডব্লিউ চৌধুরীকে জানান শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার দলের সাথে বৈঠকের পর প্রতিদিন ইয়াহিয়া খানকে বসতে হয় সামরিক জান্তার সঙ্গে। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে যে ছাড় দিচ্ছেন তাতে জাতীয় সরকারকে দুর্বল করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাকে হুশিয়ার করে দেয় সামরিক জান্তা। আপোস সমঝোতা সম্পর্কে আভাস পাওয়া গেল পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ২২ মার্চে দেওয়া প্রেসিডেন্টের ভাষণে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে একতানে এক যোগে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বসে সাধারণ লক্ষ্যে যাতে কাজ করে যেতে পারে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্যে সে মঞ্চ এখন তৈরি হয়ে গেছে। একই দিন ২২ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, যদি তারা আমাদের দাবি মেনে নেন তাহলে সম্ভবত আমরা বন্ধু হিসেবে এখানো বাস করতে পারব।

২২ মার্চ তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের খান আব্দুল ওয়ালী খান শেখ মুজিবুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন, শেখ সাহের, আমাকে বলুন, আপনি কি এখন পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন। শেখ মুজিবুর রহমান উত্তর দিয়েছিলেন খান সাহেব, আমি মুসলিম লীগ পন্থী। এ কথার, অর্থ ওয়ালী

www.pathagar.com

খান ভারত বিভক্তির বিরোধিতা করেছেন আর শেখ মুজিবুর রহমান মুসলীম লীগে থেকে পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন, তিনি এখন পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানের বিশ্বাসের উপর রয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রেডিসেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে যে আলাপ হয়েছিল, তারা কতদূর সফল হয়েছিলেন তা পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী জি. ভাব্লউ চৌধুরী বলেছেন, শেষের দিকে, একেবারে আম এ্যাকনি নেওয়ার আগে ইয়াহিয়া খান যে প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন আমি মনে করি ছয় দফার প্রায় নব্বই ভাগ তার মধ্যে বর্তমান ছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আপোস সমঝোতায় আসা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতায় যেতে পারল না কেন? জি. ডব্লিউ চৌধুরী তার, নিহিত গ্রন্থে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। পীরজাদাকে জিজ্ঞেস করা হল কেন শ্বেত পত্রের পুরো বিবরণ প্রকাশ করা হল না, এতে জবাব ছিল, চাপ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে একটি ঘোষণা পত্র তৈরী করা হয় এবং সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আপোস সমঝোতায় আসায় ইয়াহিয়া খানের যে ক্ষমতা ছিল তাও সামরিক জান্তা হরণ করে নেয়। ইয়াহিয়া খান অথর্ব হয়ে পড়ে।

জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রথম দিকে ঢাকায় আলোচনায় আসতে চান নি। কিন্তু আপোস সমঝোতার খবর পৌঁছতেই ২১ মার্চ চলে আসেন ঢাকায়। ২২ মার্চ আলোচনায় বসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। সামরিক জান্তার সাথে একত্রে আপোস সমঝোতা বাতিল করে দেওয়ার জন্যে উঠে পরে লেগে যায়। এ বিষয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, সামরিক আইন তুলে নেওয়া যাবে না। বরং সে বলল, পাকিস্তানের দু অংশের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল দু অংশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবে।

এদিকে আপোস রফা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর এক দফা আন্দোলনকারী দল প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস ২৩ মার্চকে প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা করে পল্টন ময়দানে মার্চ মিছিল করে। আনুষ্ঠানিকভাবে তোপ ধ্বনির মাধ্যমে তোলা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। রাইফেলের ফাকা আওয়াজ তুলে ২১ বার তোপধ্বনি করেন কামরুল ইসলাম খশরু এবং পিস্তল ফুঠিয়ে পতাকা উত্তোলন করেন হাসানুল হক ইনু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা পঠিত হল। আ. স. ম আব্দুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আসম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ বাংলাদেশের পতাকাকে সালাম প্রদর্শন করেন।

www.pathagar.com

এরপর আ. স. ম. আব্দুর রব একটি খণ্ড মিছিল নিয়ে যান শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেন শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ীর গেট অথচ শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে যাওয়ার কোন প্রোগ্রাম তাদের ছিল না।

শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে সর্বশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ২৪ মার্চ। ইয়াহিয়া খানের মূখ্য আলোচক পাকিস্তান প্লানিং কমিশনের চেয়ারম্যান এম. এম. আহমদ বৈঠকে খসরা ঘোষণা পত্রের সংশোধনী অনুমোদন করেন। বৈঠক শেষে ২৫ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে আমাদের কর্তব্য শেষ করেছি এবং প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ দিনই তিনি নতুন নির্দেশ জারি করলেন। তিনি বললেন, টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এবং টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপে সকল উৎপাদন বিভাগ অনতি বিলম্বে চালু হবে। তিনি আরো বলেন পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।

২৪ মার্চের বৈঠকে অনুমোদিত খসরা ঘোষণা পত্রটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস. এম. জি পীরজাদার সাথে বৈঠকের পর চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার কথা ছিল। পীরজাদারই জানানোর কথা ছিল অনুষ্ঠেয় বৈঠকের সময়। পীরজাদার পক্ষ থেকে কোন সাড়া এলো না। এম, এম, আহমদ ২৫ মার্চ তারিখ সকালেই রওয়ানা দেন করাচির এর উদ্দেশ্যে বিনা নোটিশে। এর অর্থ হামলা প্রস্তুতির চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত রাজনৈতিক দলের নেতারা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্সের (পি আইএ) বিমান ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগ করা শুরু হয়ে যায়। বিদেশী বিমানগুলো তাদের লোকজন সরানোর কাজও সম্পন্ন করে ফেলে।

২৬ মার্চ রাত ১ টায় পরিচালিত হবে সামরিক হামলা। পাকিস্তানী বাহিনী তৈরি হয়েছিল। অপেক্ষায় ছিল চূড়ান্ত আদেশের। ২৫ তারিখ সকাল এগারটায় জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে নির্দেশ এলো ঢাকা সেনানিবাসে জেনারেল অফিসার কমানডিং মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার কাছে। বিলম্ব তার সইছিলনা। নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘন্টা আগেই ২৫ মার্চ তারিখ রাত সাড়ে এগারটায় খাদিম হোসেন রাজা খুলে দিলেন ঢাকা সেনানিবাসের গেটগুলো। ট্যাংক, কামান, মর্টার, মেশিনগানে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসে পাকিস্তানী সৈন্যরা। হাজার হাজার নিরস্ত্র খেটে খাওয়া মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। স্বেচ্ছা বন্ধীত্ববরণ করলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

www.pathagar.com

মুক্তি সংগ্রামে চট্টগ্রাম

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগের দিনগুলো সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান জীবন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছিল। এজীবন্ত আগ্নেয়গিরি সহসা একটি ভয়ংকর শব্দে অসংখ্য জ্বালামুখে রূপান্তরিত হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছোট-বড়ো জ্বালামুখ মুক্তিযুদ্ধের উত্তপ্ত শিখা নিক্ষেপ করতে শুরু করে।

চট্টগ্রাম বন্দরনগরী বাঙালি এবং অবাঙালিদের মধ্যে দেখতে শুরু করে এক অশুভ মুখোমুখি সংঘাতের সূচনা চট্টগ্রাম শহরের অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকা। অবাঙালীদের এলাকা হচ্ছে ওয়ারলেস্ কলোনি, ইস্পাহানি কলোনি, সরদার নগর এবং শেরশাহ কলোনি। এসব এলাকা পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা গোপনে আদ্র শাস্ত্র প্রেরণ করতে শুরু করে। এ ছাড়াও পাকিস্তানীদের মদদ পেয়ে অবাঙালিরা বাঙালিদের বাড়ি-ঘর এবং দোকানপাট লুট করে অস্ত্র সংগ্রহ করে।

অসহযোগ আন্দোলনকালে যখন বন্দরনগরী নিষ্প্রাণ অবাঙালিরা তা ব্যর্থ করার জন্যে নারকীয় অবস্থার সূচনা করে। সশস্ত্র শক্তির সরাসরি সাহায্য পেয়ে অবাঙালিরা কুৎসা রটনাসহ বাঙালি রক্ত ঝরাতে তৎপর হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে পুরোপুরি এলাকা নেই। এর ফলে বাঙালিরা শহর এলাকায় সহজভাবে চলাচলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

চট্টগ্রামের ছ'মাইল দূরে নতুনপাড়া সেনানিবাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার অবস্থিত। সীতাকুণ্ড পাহাড়ের সারি হাটহাজারি সড়কের মাধ্যমে একদিকে আবর্তিত, অন্যদিকে বঙ্গোপাসগর-এর মাঝামাঝি নতুনপাড়া দাঁড়িয়ে আছে বাঙালি শক্তির দুর্গপ্রচীরের মত। এর মধ্যে রয়েছে ২৫০০ জন সৈনিক– অধিকাংশই নবপ্রবিষ্ট-এবং এদের কমান্ডে রয়েছেন একজন বাঙালি ব্রিগেডিয়ারসহ বেশ কয়েকজন বাঙালি অফিসার এবং জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার। ব্রিগেয়ির মজুমদার ধৈর্যের সাথে ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী কর্নেল শিগরী হচ্ছেন উপ-অধিনায়ক। প্রধান প্রশিক্ষক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম. আর. চৌধুরী হচ্ছেন আরেকজন বাঙালি অফিসার। লেফটেন্যান্ট জর্নেল জেড, এস. ওসমানী, উর্দুভাষী অফিসার, এডজুটেন্ট এবং কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল।

www.pathagar.com

২০তম বেলুচ রেজিমেন্ট-এর সৈন্যরা আগে থেকেই এসে জমায়েত হচ্ছে। চট্টগ্রামের প্রতিরক্ষার জন্যে আরো পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য লাইন ধরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

বায়েজীদ বোস্তামী রোডে অবস্থিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের খালি টিনশেডে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরবর্তী যে কোনো স্টিমারে করাচি যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজোয়া স্বল্প লোকজনের এই ব্যাটালিয়নের কমান্ডে রয়েছেন। চারশ'র মত সৈন্য এর অন্তর্ভুক্ত। ষোলশহর নগরীর দু'টি প্রধান নির্গমন পথের নিয়ন্ত্রণকারী অবস্থানে রয়েছে। এই ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড-ইন- কমান্ড হচ্ছেন মেজর জিয়াউর রহমান। তিনি হচ্ছেন একজন উজ্জ্বল এবং তরুণ অফিসার। তদুপরি রয়েছে ইপিআর-এর ৬০০ সৈনিক-যাদের মধ্যে ৩০০ জন হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী। সেক্টর কমান্ডার হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল আজিজ শেখ। তার এডজুটেন্ট হচ্ছেন ক্যাপ্টেন রফিক।

সৈনিকদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী উপাদান জনবলের দিক থেকে তেমন বেশি কিছু নয়। ২৪ মার্চ ২০ তম বেলুচ রেজিমেন্টের সেন্টারের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমিকে দায়িত্ব দেয়া হয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল রেজিমেন্টাল সেন্টারের বাঙালি অফিসার এবং জওয়ানদের নিরস্ত্র করার জন্যে। এ কাজের জন্যে ব্যাটালিয়ন সদর দফতরসহ রাইফেল কোম্পানীর আনুমানিক ৬০০ সৈনিক তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিমানের মাধ্যমে চট্টগ্রামে এনে দ্রুততার সাথে এ ব্যাটালিয়নকে নতুন পাড়ায় মোতায়েনে করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এদের কার্যকাল দু'বছর হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানে স্থানান্তরের অপেক্ষায় ছিল। ব্যাটালিয়নের অগ্রবর্তী দল জানুযারি মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে।

২৫ মার্চ ২৭ তম পাঞ্জাব আকাশপথে আগমন শুরু করে। প্রথম কমান্ডো ব্যাটালিয়নের কমান্ডোরা সাদা পোশাকে অবাঙালিদের সাথে মিশে তাদের শক্তিবৃদ্ধির কাজে লেগে যায়। পতেঙ্গা বিমান বন্দরেও কিছু সংখ্যক কমান্ডোকে প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হয়। পাকিস্তান নৌবাহিনী আগে থেকেই ঐ দায়িত্বে ছিলো। নৌ–ঘাটিতে অবাঙালিদের প্রাধান্য রয়েছে। পি. এন. এস বখতিয়ার বন্দরের জেটিতে এসে নোঙ্গর করে।

তিনি রয়ে গেলেন নীরব এবং পর্যবেক্ষণকারীর ভূমিকায়। ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে বাহ্যত নিস্পৃহ থাকার চেহারা ধারণ করে তিনি নীরবে নির্দেশ দেন

www.pathagar.com

নবাগত সৈনিকদের অস্ত্র এবং ক্ষুদ্র সমরসম্ভাবের থলে সরবরাহ করার জন্যে। সতর্ক এবং সচেতনভাবে পরিস্থিতির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে যাবার জন্যে তিনি তাদেরকে পরামর্শ দেন।

বিশাল অস্ত্রাগার নিয়ে এম. ভি. সোয়াত যখন বন্দরে আসে তখন তিনি শুধু তাকিয়ে থাকেন। কুলী এবং মাল খালাসের কর্মচারীরা যখন পুরোপুরি কাজ বন্ধ রেখে জাহাজ থেকে মাল নামাতে অসম্মত হয়, তখন একজন সহকারী সামরিক প্রশাসক হিসাবে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন। তার এ নীরবতা কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়।

২৪ মার্চ একটি সামরিক হেলিকপ্টারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবদুল হামিদ খান, লজিস্টিক এরিয়া কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এম. এইচ. আনসারিসহ চট্টগ্রামে ছুটে যান। এম. ভি. সোয়াত থেকে মাল খালাস করা হয় নি। পাকিস্তানীদের পক্ষে হেলাফেলা করে কালক্ষেপণ করার সুযোগ নেই। মজুমদার একজন বাঙালি। কাজেই তাকে অপসারণ করা হয়। নেতৃত্বের পর্যায়ে এ পরিবর্তনের জন্যে তাদের পক্ষে যথাযথ অজুহাত প্রদর্শন করা তেমন কষ্টকর ছিল না।

অপরাহ্নে তিনজন যাত্রীসহ পেলিকপ্টারটি ঢাকা ফিরে যায়। তিনজন হচ্ছেন জেনারেল হামিদ খান, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এবং ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী। তিনি যে অপসারিত হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার অবশ্যই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার আনসারি এখন ক্ষমতায়। চট্টগ্রামের অবস্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শিগরী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার-এর কর্তৃত্বে নিয়োজিত হন। তার সহকারীদের দায়িত্বে আসেন ওসমানী। লেঃ কর্নেল এম. আর. চৌধুরী নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিস্মৃত। এমন কি নিজের লোকজন সম্পর্কেও। তিনি এও জানতেন না যে, পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার ভাগ্যে ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসছে।

২৫ মার্চ সকাল আটটায় একটি হেলিকপ্টার অর্ধ ডজন সিনিয়র অফিসারসহ ঢাকা সেনানিবাস ছেড়ে যায়। এটা চলছে বার্তা প্রেরণের কাজে। হেলিকপ্টারে রয়েছেন মেজর জেনারেল জানজোয়া, মেজর জেনারেল এ. ও. মিঠ্ঠা, মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ, মেজর জেনারেল ওমর এবং

www.pathagar.com

কর্নেল সাদউল্লাহ। কর্নেল সাদউল্লাহ হচ্ছেন একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন অনুভূতিহীন গোঁড়া ধার্মিক। তার হাতে বেশ কয়েকটি বদ্ধ খাম।

প্রত্যেকটি খামে শ্রেণীবদ্ধ নিরাপত্তামূলক চিহ্ন রয়েছে। হেলিকপ্টারটি প্রত্যেকটি গ্যারিসনে অবতরণ করে এবং বার্তাযুক্ত খামটি পৌঁছিয়ে দিয়ে বেশ ব্যবসাসুলভ ভাব নিয়ে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে চলে যায়। এভাবে এহেড' বা নির্দিষ্ট কর্মসূচী নির্ধারিত লগ্নে শুরু করার লিখিত সংকেত জানিয়ে দেয়া হয়। ঐ সংকেতের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উঠতি প্রজন্মকে বিলুপ্ত করা।

রেজিমেন্টাল সেন্টার-এর বাঙালি সৈনিকদের অস্ত্র ছাড়া ডিউটি করার নির্দেশ দেয়া হয়। সোয়াত থেকে অস্ত্র নামিয়ে আনার জন্যে বেলুচ রেজিমেন্টের প্রহরায় এক কোম্পানী সৈনিককে প্রেরণ করা হয়। ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের এডজুটেন্ট মেজর মীর শওকত আলীকে আদেশ দেয়া হয়–এক কোম্পানী বন্দর এলাকার ডিউটিতে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে। আরেকটি কোম্পানীকে মোতায়েন করা হয় ইস্পাহীনী পাহাড়ে ব্যাটালিয়নের অবশিষ্ট অংশ ষোলশহরে নিজেদের অধিকাংশ পরিবার নিয়ে অবস্থান করে।

আক্রমণ শুরু করার বিশেষভাবে পরিকল্পিত প্রথম দিবস-এ রাত১১টা ৩০ মিনিটে ২০তম বেলুচ রেজিমেন্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার ঝটিকা আক্রমণ করে দখল করে নেয়। ঘুমন্ত বাঙালি সৈনিকদের হত্যা করা শুরু করে। পারিবারিক বাসস্থানসমূহও আক্রমণের লক্ষ্য হয়। ২৫ মার্চের কালো রাতে সর্বমোট নিহতদের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নগরীতেও ছড়িয়ে পড়ে হত্যাযজ্ঞের বিস্তৃতি জোরদার করার জন্যে।

ষোলশহরে জানজোয়া এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বন্দরে অগ্রসর হওয়ার জন্যে মেজর জিয়াকে নির্দেশ দেন। তিনি মেজর জিয়ার জন্যে এমনকি একটি নৌ-বাহিনী ট্রাকও যোগাড় করেন। তাকে বন্দরের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে স্বস্তিবোধ করেন। তখন রাত ১১টা ৩০ মিনিট। যাত্রা শুরু করেই মেজর জিয়া দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। রাস্তায় গড়ে-তোলা বেশ কয়েকটি ব্যারিকেড সরিয়ে যখন তিনি আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় পৌঁছেন তখন তার ব্যাটালিয়নের একজন অফিসার ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান তাকে আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় নিরস্ত করেন। এটি হচ্ছে একটি মোড়

www.pathagar.com

পরিবর্তনকারী ঘটনা। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, বন্দর তার জন্যে একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়। একথা শুনে মেজর জিয়া অবিলম্বে ষোলশহরে ফিরে যান এবং তার অফিসার এবং সৈন্যদের নির্দেশ দেন পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার জন্যে। সবাই তার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানায়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জান জোয়াকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বন্ধী করা হয়। পরবর্তী সময়ে তার ব্যাটস্‌ম্যান মেজর জিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মেজর জিয়াকে বন্দরে পাঠানোর জন্যে তাকে হত্যা করে।

২৫ মার্চ-এর ভয়াবহ রাতে, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর ক্যাপ্টেন রফিক পাকিস্তানী পক্ষ ছেড়ে কৌশলের সাথে ওয়ারলেস কলোনি, রেলওয়ে হিলস্ এবং হালিশহরকে চলমান সংকট থেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেখকে শিয়ালবোকায় বন্দী করে মেজর জিয়ার কাছে সোপর্দ করা হয়। পরবর্তীকালে তাকে ভারতীয় বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। রাতের নীরবতাকালে চট্টগ্রাম ক্যাপ্টেন রফিকের নিয়ন্ত্রণে আসে। রামগড় এবং কাপ্তাইয়ে অবস্থানরত তার সৈনিকদের বার্তা পাঠিয়ে চট্টগ্রামে যুদ্ধে জড়িত সৈনিকদের সাথে যোগদান করার নির্দেশ দেন।

ভোরবেলা ভয়াবহ ঘটনার খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ে। মুজিব-ইয়াহিয়ার সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেছে। ঢাকায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং নতুনপাড়ায় নিদ্রিত বাঙ্গালি সৈনিকদের ওপরে হত্যাভিযান এখন আর গোপন নেই– সবাই জেনে গেছে। নতুনপাড়া থেকে জীবিত সৈনিকেরা হয় শহরে নয়তো পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

মেজর জিয়ার ঘোষণা

২৫/২৬ মার্চ রাতে মেজর জিয়া পুনরায় সংগঠিত, শক্তিশালী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে চট্টগ্রামের ওপরে চরম আঘাত হানার জন্যে তার ব্যাটালিয়ন নিয়ে শহরে উপকণ্ঠে সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী সৈনিকেরা পটিয়ার কাছাকাছি এক স্থানে সমবেত হয়।

ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ -এর ১৭তম উইং কাপ্তাই থেকে ক্যাপ্টেন রফিকের সাথে যোগদান করতে যাওয়ার পথে সকাল আটটায় জিয়া কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদিন ছিলো ২৬ মার্চ। উক্ত উইং-এর সবাই মেজর জিয়ার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর সৈনিকেরা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। বেলা ৪ টার সময় মেজর জিয়া নিজে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তারপর ৩৫০ জন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকসহ ইপিআর-এর ২০০ সৈনিককে বিভিন্ন টাস্ক ফোর্স গঠনের মাধ্যমে একেকজন অফিসারের কমান্ডে নিয়োগ করা হয়। উদ্দেশ্য হল চট্টগ্রাম শহরকে কয়েকটি সেক্টরে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি সেক্টর একটি টাস্ক ফোর্সের হাতে ন্যস্ত করা।

এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ২৭ মার্চ মেজর জিয়া কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তার প্রথম ঘোষণা প্রচার করেন। এ ঘোষণায় তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে উল্লেখ করেন। অবশ্য ঐ মুহূর্তে বিরাজমান অস্থিরতা এবং বিভ্রান্তির ফলে এমনটি ঘটেছে বলে অনুমতি হয়।

তার ২৭ মার্চের ঘোষণার সংশোধন করে ২৮ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত সেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া আরেকটি ঘোষণা পাঠ করেন; যা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

ক. আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, এতদ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি;

খ. আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমরা ইতঃপূর্বে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি সার্বভৌম বিধিসম্মত সরকার গঠন করেছি যা আইন এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে;

www.pathagar.com

গ. নব্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী নিরপেক্ষনীতি গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সরকার সকল রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব কামনা করবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তির জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে;

ঘ. বাংলাদেশে পরিচালিত পাশবিক গণহত্যার বিরুদ্ধে যার যার দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্যে আমি (বিশ্বের) সকল সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি;

ঙ. শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন (এই) সরকার হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌম আইনানুগ সরকার এবং বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জাতির স্বীকৃতির দাবিদার।

মেজর জিয়া আরো বলেন, আমরা কুকুর এবং বেড়ালের মত মরবো না। মরতে হলে বাংলা মায়ের সুসন্তান হিসেবে মরবো। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইলেফস্ এবং পুরো পুলিশ বাহিনী চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, বরিশাল এবং খুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘিরে ফেলেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে।

উপরোক্ত ঘোষণা সারাদেশে এবং বিদেশে শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর ফলে বিচ্ছিন্ন পর্যায়ের প্রতিরোধ সংগ্রামীরা মানসিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

www.pathagar.com

মুক্তিবাহিনী গঠনপ্রক্রিয়া শুরু

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হামলার মুখে বিদ্রোহী বাঙালী সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়। তাদের অনেকের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়েছিল। সকলেই নিজেদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

এ বিদ্রোহীদের তেজস্বিতায় ঝিম ধরে এবং স্বাধীনতার অগ্নিশিখা যা তাদের অন্তরে দীপ্যমান। তা এর মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে। মনে হয় যেন বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে। ২৬ মার্চ যে বিদ্রোহের শুরু, তা এখন মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। স্ফুলিঙ্গকে প্রজ্জ্বলিত রাখার সময় এখন। পরিচর্চার মাধ্যমে জীবনী শক্তি সঞ্চারের এখন সময় এসেছে।

সীমান্ত অতিক্রম করে বিদ্রোহী বাহিনীর ভারতে প্রবেশের কিছুদিনের মধ্যে একটি সাধারণ কমান্ড কাঠামো খাড়া হয়ে গেল। কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার বিভিন্ন সেক্টরে হামলা চালানোর দায়িত্ব নিলেন। মেজর খালেদ মোশারফ সিলেট, কুমিল্লা মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, এবং মেজর শফিউল্লাহ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল। মেজর ওসমান কুষ্টিয়া যশোর এবং মেজর জলিল ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালী এলাকার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। এরা সবাই ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চৌকস অফিসার। প্রথম দুজন কমান্ডো কোম্পানীর সাথে জড়িত ছিলেন এবং সে বিষয়ে প্রচুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তারা দুজন।

বিদ্রোহীরা ভারতে আসার পর তাদের বাহিনীর পরিচালিত হামলার ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক হওয়ার ফলে ভারত সরকারকে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে বাধ্য করে। প্রথম দিকে সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে থাকে। ঘটনাকে তারা প্রথম দিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখে। কিন্তু প্রতিদিন ভারতে প্রায় ষাট হাজার শরণার্থী প্রবেশ করা অবস্থা নাজুক পর্যায়ে পৌছতে লাগল। তখন ভারত আর নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। প্রায় ২৩০০ কিলোমিটার জুড়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় অনেক শরণার্থী ক্যাম্প গড়ে ওঠে। প্রতিটি ক্যাম্প বাংলাদেশের শরণার্থী দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। এ সমস্ত ক্যাম্পে শরণার্থীদের অবস্থা দেখে বিবেকবান মানুষের বিবেক দংশন করতে থাকে। শরণার্থীরা

www.pathagar.com

বহন করে আসার মত মালামাল সাথে করে নিয়ে আসেন। অধিকাংশ শরণার্থীর ছিন্ন বস্ত্র এবং সকলেই থাকত তখন ক্ষুধার্ত। এ শরণার্থীদের খাদ্য দেওয়া এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ভারত সরকারের নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে। কিন্তু তখন ভারতে অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় পর্যায়ের ছিল। ভারতের পক্ষে দীর্ঘদিন এ বোঝা টেনে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে শরণার্থীর আগমন ঠেকানোর চিন্তাভাবনা করতে থাকে। কিন্তু এ পন্থা অবলম্বন করলে বাংলাদেশের মানুষ আরো বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে। শরণার্থীদের গতিবিধি আশ্রয় কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়। কারণ শরণার্থী যদি দেশের ভেতরে চলে যায় তবে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শরণার্থীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সবাই ছিল। ভারতে এ শরণার্থী দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে এবং এতে প্রচুর সমস্যা হবে। ভারত সরকারের সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হল এ বিদ্রোহের কারণে তাদের নিরাপত্তাগত হুমকি। চরমপন্থীরা তখন পশ্চিম বাংলায় সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে আইন শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটছে। তাদের দমনের জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি এ চরমপন্থীদের হাতে চলে যায় তবে ভারতে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হবে।

এ কারণেই ভারত সরকার চিন্তা করল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে ভোট দিয়েছিল কাজেই তাদেরকে সমর্থন করা উচিত।

এ হিসেবে দুধরনের সাহায্যের কথা বিবেচনা করা হয়। প্রথমটি গেরিলা যুদ্ধের সুবিধাসহ সীমিত পর্যায়ের অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা। ভারতীয় বি এস এফ ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে কিছু সহায়তা প্রদান করেছে। কিন্তু সেটা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। কাজেই সেনাবাহিনীকে এ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহায্য হল কূটনৈতিক সহায়তা। যদিও ভারত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয় নি তবু এ সরকার কলকাতার মুজিব নগরে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলো তাজউদ্দীন আহমদ।

প্রথম দিকে ভারত সরকার সেনাবাহিনীকে এ সংঘর্ষে জড়িত করতে ইচ্ছুক ছিল না। ভারত সরকার যখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য ইয়াহিয়া

www.pathagar.com

খানকে অনুরোধ করে তখন ইয়াহিয়া খান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এতে ধারণা হয় পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে, ভারত সরকারের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে। সে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ভারত সরকার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

১৪ এপ্রিল কর্নেল আতাউল গনি ওসমানিকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ইন-চীপ নিযুক্ত করা হয়। আতাউল গনি ওসমানি নিজেকে বাংলাদেশের দ্য গল মনে করতেন। প্রবল আবেগ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইমার্জেন্সী কমিশন অফিসার হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি ভারতীয় রাজকীয় আর্মি সার্ভিস কোর এ কমিশন প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানেরপদাতিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনে তার ভূমিকা ছিল সক্রিয়। এর স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে রেজিমেন্ট পিতা বলে অভিহিত করা হয়। পেশাগত দক্ষতার কারণে তাকে মিলিটারী অপারেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে মনোনীত করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সাথে মতবিরোধের কারণে তিনি চাকুরী ছেড়ে দেন।

চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। সংকটের সময় অন্যরা যখন বিচলিত হয়ে পড়ে তখন তিনি প্রেরণার উৎস হিসেবে সদায় বিরাজ মান থাকতেন। নিঃসন্দেহে তিনি অস্থায়ী সরকারের শক্তির একটি স্তম্ভ ছিলেন। এবং সকল কর্মকাণ্ডে একাগ্রতা ছিল তুলনাহীন। মর্যাদার বিষয়ে তিনি ছিলেন অতি মত্রায় সচেতন। সে কারণে প্রটোকলের মত তুচ্ছ বিষয় নিয়েও তিনি টানা হেচড়া করতেন। তিনি চাইতেন স্বাধীন দেশের সেনা প্রধানের মর্যাদা তাকে দেওয়া হোক। ভারতীয় বিমান বাহিনীর কমাণ্ডার রানওয়েতে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা না জানান পর্যন্ত তিনি বিমান থেকে নামেন নি। যদিও কমাণ্ডার আসার ১০ মিনিট আগে তার বিমান এসে যায়। কিন্তু কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীর নির্দেশে পাইলট কমাণ্ডারের আগমন পর্যন্ত বিমান ঘাটির ওপর চক্কর দিতে হয়। তার কথা হল, আগে ভারতীয় কমান্ডার রানওয়েতে এসে দাঁড়াবে তাকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য। তারপর তিনি বিমান থেকে অবতরণ করবেন। তার কথা হল তার দেশ সাহায্য চায় কিন্তু ভিক্ষা চায় না। যুদ্ধে তার লোকেরা ব্যর্থ হয়েছে

www.pathagar.com

পরাজিত হয় নি। যদিও পদবিন্যাসে তিনি জুনিয়র ছিলেন তবু মর্যাদার দিক দিয়ে ভারতীয় প্রতিপক্ষের চেয়ে খাটো ছিলেন না।

এ বাস্তবতা বিবর্জিত আত্ম সম্মানবোধের জন্য অনেকে উপহাস করতো। তার কয়েকজন অফিসার তাকে বুড়ো হাবড়া বলতো। বলতো সময়ের সাথে বেমানান রক্ষণশীল এ মানুষ। একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় তিনি এসময় পদোন্নতী চান নি যা অন্যরা এ আশা ত্যাগ করতে পারতো না।

কর্নেল আতাউল গনী ওসমানী খুব দ্রুততার সাথে তার নিজের লোকবল অস্ত্রবল ও যুদ্ধ ক্ষমতা নিরূপণে নামলেন যাতে লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনা রচনার জন্যে তিনি তাদের পূনর্গঠন করে সজ্জিত করে প্রশিক্ষণের কাজে হাত দিতে পারেন। নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় পাঁচ ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন সীমন্ত দিয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় ভারতে প্রবেশ করে। এর মধ্যে অনেকে মারা যায়। গোলাবারুদ, ভারী অস্ত্র ছিল না। কাঁধে করে একজন যা বয়ে আনতে পারে সেটাই তাদের সাথে ছিল। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ের অফিসারের সংখ্যাও ছিল কম। জেসিও ও এনসিও ক্যাডার অফিসার ছিল খুবই অল্প সংখ্যক। যুদ্ধের সাজ সরজামের মধ্যে ঘাটতি থাকলেও সেটা চেপে যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তেজস্বিতার পাশে।

৩০ এপ্রিল ভারতীয় বাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার পর অনুধাবন করা গেলে যে, ভিয়েংকং ধরনের যুদ্ধ পরিচালনা এবং এর বিশালত্বের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার শৃঙ্খলা ও রণকৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত হল যদি বাংলাদেশ বাহিনীকে ভারতীয় বাহিনীর সম অংশীদার করে দেশ মুক্ত করার লক্ষ্যে যৌথ বাহিনী হিসেবে আক্রমণ করতে হয়, তবে এ বাহিনীর লড়াই করার ক্ষমতার উন্নতির জন্য তাদেরকে দ্রুত সংগঠিত করতে হবে। এ বাহিনী যাকে মুক্তি বাহিনী বলা হয় তাকে তিনটি ব্রিগেডে সংগঠিত করার প্রস্তাব করা হল যাতে সেগুলো আলাদাভাবে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। হাতের কাছে পাঁচটি ব্যাটেলিয়ান পাওয়া গেল। কিন্তু এক ব্যাটেনিয়ানে সে সৈন্য থাকার কথা তা ছিল না। কাজেই ই,পি আর এর লোক নিয়ে ব্যাটেনিয়ানকে শক্তিশালী করা হল। ভারতীয় বাহিনীর ব্যবহৃত সামানের অস্ত্র তাদের দেওয়া হল। আরো চারটি ব্যাটেলিয়ান গঠন করার পরিকল্পনা করা হল।

পুনর্গঠিত প্রক্রিয়ায় প্রধান সমস্যা দেখা দিল ক্যাডেট স্তরের অফিসার পাওয়া ও নতুন বিক্রুটদের প্রশিক্ষণ দেওয়া নিয়ে। ১৩০ জন ক্যাডেট পাওয়া

www.pathagar.com

গেল। এদের অধিকাংশ ছাত্র। এক কঠিন শ্রমসাধ্য কর্মসূচির অধিনে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হল। পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসাররা বাংলাদেশ বাহিনীতে সিনিয়র পদ লাভ করে। তারা মনে করে ভারতীয় অস্ত্র-সস্ত্র গোলা বারুদ এবং প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন। কিন্তু তারা জানতো না ভারতীয় বাহিনীকে সজ্জিত করতে যথেষ্ঠ মূল্য দিতে হয়েছে।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশ বাহিনী আটটি নিয়মিত ব্যাটেলিয়ান এবং একটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট গঠন করতে সক্ষম হয়।

এগুলো তিনটি ব্রিগেডে ভাগ করা হয়। এদের নামকরণ করা হয় জেড কে এবং এ ফোর্স। একেকটি ব্রিগেড গঠিত হলো তিনটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ান ও একটি গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়ান নিয়ে। গোলন্দাজ ব্যাটেনিয়ানকে দেওয়া হলো ১০৫ মিলিমিটার ইতালীয় হাউটজার কামান। এসব কামান ভারতীয় ধাচে তৈরি কিন্তু তারা অজ্ঞাতসারে পাকিস্তানী কলাকৌশল অনুসরণ করে চলে।

সমাবেশ নিয়ে মতভেদ ঘটে। ওসমানী চেয়েছিলেন তাদেরকে আলাদা দায়িত্ব সম্বলিত একটি আলাদা সেক্টর বন্টন করা হোক। কোনভাবেই তিনি তার বাহিনীকে ভারতীয় বাহিনীর অংশ হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি।

বাংলাদেশী বাহিনীর নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে প্রথম ব্রিগেডের কামান্ডার জিয়াউর রহমানের সাথে ওসমানীর মত বিরোধ দেখা দেয়। জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন ব্যাটেলিয়ানকে কোম্পানীতে ভাগ করতে যাতে তারা কমান্ডো পদ্ধতিতে বিশেষ গ্রুপ হিসেবে লড়াই করতে পারে। আর ওসমানী চেয়েছিলেন প্রচলিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করতে।

সশস্ত্র বাহিনীর অপর দুটি শাখাকে যুদ্ধে শামিল করানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠন করল। তা ছিল আকারে খুবই ছোট।

নৌ বাহিনী হালকা ধরনের দুটি যুদ্ধ জাহাজ জোগাড় করে। একটি এম ভি পলাশ অন্যটি এম ভি পদ্মা। ৪০ মিলিমিটার বোফোর্স কাসনে দিয়ে এ দুটিকে সজ্জিত করা হয়। বিমান বাহিনী গঠিত হয় একটি ডাকোটা এবং একটি অটার বিমান ও একটি অ্যালিউট হেলিকপ্টার নিয়ে। ক্রূরা সব পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অফিসার তারা পালিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে দশজন অফিসার আর এয়ার ম্যান ত্রিশজন। অটার ও অ্যানিউটকে রকেট ও মেশিনগান দিয়ে সাজানো হয়। এর সর্বাত্মক যুদ্ধের সময় অংশগ্রহণ করে।

www.pathagar.com

মুক্তিব বাহিনী গঠন

হাজার হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কোম্পানী ও ব্যাটেলিয়ানে সংগঠিত করে মুক্তিবাহিনী নামকরণ করা হয়। এদের মধ্যে বেঙ্গল রাইফেলসের নিয়মিত ইউনিটও ছিল। তারা ভারতীয় বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ না করে নিজেদের নেতৃত্বেই যুদ্ধ করে যেখানে নেতৃত্ব ভাল ছিল সেখানে ভাল যুদ্ধ হয়েছে। তারা সাধারণত সীমান্তের কাছাকছি এলাকায় লক্ষ্য নির্ধারণ করত এবং কমান্ডো কায়দায় আক্রমণ চালাত। কিন্তু এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য তারা তেমন প্রশিক্ষণ পায় নি কিংবা যুদ্ধ উপকরণও পর্যাপ্ত ছিল না। তারা প্রায়ই এমন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের মধ্যে পড়তো যা একটু বিচক্ষণতার সাথে চেষ্টা করলেই এড়ানো সম্ভব হত।

এ মুক্তিবাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর চেষ্টা করা হয় কয়েকবার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো বড় বড় দলে পাঠানো হয়। একেকটি দলে কখনো দুশয়ের বেশি মুক্তিযোদ্ধা থাকত। ফলে ছোট ছোট গ্রাম এত বড় দলের যাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করতে পারত না। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ খুব সহজেই খবর পেয়ে যেত এবং পরিকল্পিতভাবে সে সব গ্রামে আক্রমন করত। তারপর সে গ্রামগুলোতে চলতো হত্যা, ধর্ষণ এবং ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। কারণ তারা মুক্তি যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিল। এতে করে গ্রামবাসীদের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আগমন অপ্রিয় হয়ে ওঠে। হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। যারা খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা তাদেরকে চিহ্নিত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলো জাতীয় পরিষদ সদস্যদের অধীনে ছিল। প্রশিক্ষণার্থীদের সঠিক পরিচয় সত্যায়নের জন্যে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে নিয়োগ করেন। বাঙালী অফিসাররা যে তালিকা নিয়ে আসতেন তারা অন্ধের মত সেগুলো স্বাক্ষর করে দিতেন। এদের মধ্যে কারো ভেতর ভবিষ্যত বাংলাদেশ নিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক মতলব ছিল। যেহেতু কয়েকটি বড় বড় দল অস্ত্রসহ বাংলাদেশের ভেতরে এসে হারিয়ে গেছে। এর মধ্যে কিছু দল ফিরে আসে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে এবং রিপোর্ট করে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে

www.pathagar.com

অস্ত্র-শস্ত্র তাদের খোলা গেছে। এ অশুভতৎপরতা বন্ধ করার জন্য একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। কিন্তু উচ্চাবিলাসী নেতাদের কারণে এ প্রস্তাব গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠেনা।

সেই অশান্ত সময়ে একদল উৎসর্গীকৃত প্রাণ তরুণ একত্রিত হয়। এরা বাংলাদেশে বেশ পরিচিত। এরা হলেন শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান এবং আব্দুর রাজ্জাক। এদের নেতৃত্ব বাংলাদেশের ভেতরে বাইরে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তাদেরকে মেনে নিতে পারছিল না অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে এরা নিজেদের "মুজিব বাহিনী" নামে অভিহিত হতে পছন্দ করতেন। এরা তাদের পুরানো সহকর্মীদের মধ্য থেকে ক্যাডার নির্বাচিত করে সত্যয়নপত্র প্রদান করেন। তারা বাংলাদেশ থেকে দৃঢ়চেতা, নিবেদিত প্রাণ, বিশ্বস্ত লোকদের নির্বাচিত করে নিয়ে আসেন ট্রেনিং দেবার জন্যে। তারা বলেন, মুক্তিবাহিনী কমান্ডো প্রকৃতির প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, তা থেকে তাদের লোকদের আলাদা ধারায় অপ্রচলিত যুদ্ধের ট্রেনিং পাওয়া উচিত। সেনাবাহিনী যে হাজার হাজার তরুণ মুক্তি যোদ্ধাদের ট্রেনিং দিচ্ছে তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাদের সন্দেহ ছিল এবং আওয়ামীলীগের যুব সংঠনের সাথে এরা সর্ম্পকিত ছিল না। তাই মুক্তি বাহিনীর কাছ থেকে তারা তাদের সংগঠন সেলগুলোর গোপনীয়তা রক্ষায় সাবধানতা অবলম্বন করেন।

কর্নেল আতাউল গনী ওসমানী যৌথ অধিনায়কত্বের ওপর জোর দেন। অবশ্য যেকোন যুদ্ধে এটা প্রয়োজন। আওয়ামীলীগের কিছু সিনিয়র নেতা যারা অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিল তারাও তাদের যুব শাখার এ নেতাদের ব্যাপারে মোটেই খুশি ছিলেন না। এ বিষয়ে কোন আপোস বা অন্য কিছু করার সুযোগ ছিল না। ভারতীয় বাহিনী শুধুমাত্র অস্থায়ী সরকারের মতামত গ্রহণ করত সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের মাধ্যম। অন্য কোন কতৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিল না।

এ পরিস্থিতিতে স্পষ্টতই সুসংগঠিত, প্রতিষ্ঠিত এবং তীব্র প্রেরণাদীপ্ত একটি তরুণ গ্রুপের প্রয়োজন ছিল। এ ধরনের একটা সংগঠন কি কারণে গোপনীয়তা অবলম্বন করে চলেছে তা বুঝতে কষ্টকর ব্যাপার ছিল। অবস্থা যেখানে এরকম যে কেউ মুক্তিযোদ্ধার পোশাক পরে ট্রেনিং নিতে পারে এবং কাধে অস্ত্র ঝুলিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে চলে যেতে পারে। এ সাধারণ বোধ

www.pathagar.com

নির্দেশ করে যে, মুজিব বাহিনীকে ভারত সরকার সমর্থন দেবে এবং মুক্তি বাহিনীর সাথে এ বাহিনীর সম্পর্ক সহজতর করে তোলার ব্যবস্থা করবে। কারণ মুক্তি বাহিনী যারা সরাসরি তাজউদ্দীনের অধিনায়কত্বে রয়েছে, তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তাজউদ্দীন অস্থায়ী সরকারের প্রধান হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত।

ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারী মি. এর এন কাও ছিলেন বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। আওয়ামী লীগের এ যুব শাখাটির নেতৃত্ব সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার মত ব্যবস্থা তার ছিল। একমাত্র তারাই ভাল কিছু করতে পারে এ আশা তিনি পোষণ করতেন। তিনি আরো মনে করতেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর রাজনৈতিক এলাকায় কাজ করার সুযোগদানের জন্য তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া উচিত। তাছাড়া যুব নেতাদের প্রতি আস্থায়ী সরকারের ঈর্ষাপরায়ণতার বিষয়টি তার আগোচরে ছিল। কারণ যুবনেতারা ছিলেন মাথা গরম ধরনের এবং আপোষহীন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন। কিন্তু তাদের আস্থায়ী মন্ত্রীরা ছিলেন উচ্চাভিলাসী ও মতলববাজ।

রাজনৈতিক কোন্দল

সেনাবাহিনী কেবল নিয়মিত ও কমাণ্ডো পদ্ধতি অপারেশনের ট্রেনিং দিতে পারে আর এ প্রশিক্ষণ নিতে এগিয়ে আসে হাজার হাজার তরুণ এবং একটি বাহিনী গঠনে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল যাকে মুক্তি বাহিনী নামে অভিহিত করা হয়। এ যুবনেতারা ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারকে অবগত করান যে, অনেক অবাঞ্ছিত লোক যারা বাংলাদেশে নক্সালের সমতুল্য তারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, অস্ত্র হাতে পাচ্ছে। তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এসব অস্ত্র পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। এ গুলো তারা স্বাধীনতা উত্তর কালের জন্য বাংলাদেশের ভিতরে জমা রাখছে নক্সাল ধরনের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে। তারা কিছু চীন পন্থী কমিউনিস্ট নেতার নাম বলেন, যারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারের আত্মীয় এবং এখন এ অফিসাররা মুক্তি বাহিনীতে। এদের সাহায্য ও সাম্মতিতে তারা তাদের নিজস্ব কমিউনিস্ট ক্যাডারদের দলে দলে ভর্তি করাচ্ছে। প্রশিক্ষণ নেওয়াচ্ছে এবং অস্ত্রে সজ্জিত করছে।

এ বিষয়টি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি তুলে ধরা হয়। স্পষ্টতই তা ফল উৎপাদনে ব্যর্থ হয়। মুক্তি বাহিনীর ভেতর

www.pathagar.com

আরেক ধরনের মুক্তি যোদ্ধা ছিল। যারা সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানপন্থী। স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর তারা তাদের অস্ত্র বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের হাতে যে তুলে দেবে না এ ব্যাপারে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল তাদের। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে নৃশংসতা সংঘটিত করে। তার কারণে এ সময়ে তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না। তৃতীয় আরেক একটি দল ফ্রীল্যান্স মুক্তিযোদ্ধা। এরা ছিল ডাকাত। এ সময়কে এরা আধুনিক অস্ত্রপ্রাপ্তির এবং ভারতীয় খরচে প্রশিক্ষণ নেয়ার এক সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে।

মুজিব বাহিনীর নেতাদের সাথে আলোচনা করে দায়িত্ব প্রাপ্ত ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা মুক্তি বাহিনী সদস্য বাছাইয়ে একটি নিখুঁত প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রতিদিন মুজিব বাহিনী নেতারা নতুন নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে এবং তা ভারতের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে থাকে। তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তাদেরকে দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার নিশ্চিন্ত করেন যে এর জন্যে যা করা প্রয়োজন তা করা হবে। এ সময় ব্যাপক হারে মুক্তিবাহিনী যোদ্ধাদের ট্রেনিং প্রদানের চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংখ্যার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছিল। পাওয়াও যাচ্ছিল অনেক যোদ্ধা। জাতীয় পরিষদের দুজন বাঙালী সদস্যকে মনোনীত করা হয়েছিল খাঁটি লোকদের সত্যায়ন করার জন্য। তারা তা করতেন তাড়াহুড়ার মধ্যে। স্বার্থান্বেষী সনে তাদের সামনে তালিকা পেশ করলে তা পরীক্ষা নিরিক্ষা না করেই অনুমোদন করে দিতেন। একবার অনুমোদন হয়ে গেলে যদি কোন ভুলও হয় তবু তারা তা স্বীকার করত না। পুরো ব্যাপারটা এত বেশি স্বল্প সময়ের মধ্যে করা হয় যেন স্বার্থন্বেষী সনে প্রেরিত না হয় স্বাধীন হবার পর দেশের কি হবে না হবে তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই।

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার মানেই মি. তাজউদ্দীন। তিনি মুজিব বাহিনী নেতাদের সহ্য করতে পারতেন না। তাদের প্রতিটি অভিযোগকে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিতেন। কর্নেল ওসমানী অস্থায়ী সরকারের কাছ থেকে নিজের নির্দেশ গ্রহণ করতেন। মুজিব বাহিনী নামে আলাদা একটি বাহিনীর অস্তিত্বকে তিনি সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। সে বাহিনীও সামগ্রিকভাবে তার অধিনায়কত্বে ছিল না। যদিও বাহ্যিকভাবে এর নেতাদের প্রতি বন্ধুত্ব ভাব প্রদর্শন করতেন।

www.pathagar.com

বিক্ষুব্ধ হবার কারণ

যুব নেতারা সবসময় অভিযোগ করতেন যে. জেনারেল আরোরা ও আমি তাজউদ্দীনের মধ্য একটা রাজনৈতিক সমঝোতা রয়েছে। যে কারণে দুজনেই চাপ প্রয়োগ করে চলছিলেন যে, যুব নেতাদের অধিনায়কত্ব নয়। তাদের অধিনায়কত্বে থাকবে মুজিব বাহিনী। কেননা, মি. তাজউদ্দীনের প্রতি এ যুব নেতাদের কোন আনুগত্যই ছিল না। যুবনেতারা তাজউদ্দীনকে মোটেই দেখতে পারতো না। তারা অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রতি সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীনকে শ্রদ্ধা করতেন না।

যুব নেতারা প্রাক্তন এম, এন, এ ও এমপিএদের প্রভাবিত করেন তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে এ রকম প্রচারণা চালিয়ে যে তিনি জবর দখলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাদের মতে, প্রধানমন্ত্রিত্ব ন্যায়ত অন্য কারো পাওয়া উচিত ছিল। তাদের একমাত্র পছন্দসই ব্যক্তি ছিল সৈয়দ নজরুল ইসলাম। যদি তারা তাজউদ্দীনের ব্যাপারে তাদের প্রভাব কার্যকর করতে নামতেন তাহলে এক বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। অস্থায়ী সরকারের ভেতরে যদি বিভক্তি দেখা দিত তবে তা সমগ্র সংগ্রামের জন্য বিপর্যয়কর অবস্থা হয়ে দাঁড়াতো। যদি যুবনেতারা বুঝতে সক্ষম না হত তবে তাদের পদক্ষেপ লক্ষ্য অর্জনের পথে হত বিপজ্জনক। আর তা হল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাছাড়া স্বাধীনতার পর এর ফলাফল হত আরো মারাত্মক। সৌভাগ্যবশত তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও তারা সমঝোতায় এসেছিল কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাজউদ্দীনকে চিবিয়ে খেত। পরে সম্ভবত সৈয়দ নজরুল ইসলামও এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়। এ ভাবে একটি রাজনৈতিক সংকট দূর হয়।

এ যুবনেতাদের বিক্ষুব্ধ হবার আর একটি কারণ আছে, আর তা হল কয়েকজন পরিচিত বাংলাদেশী নকশালের সাথে ভারতীয় কর্মকর্তাদের গল্পগুজব করতে দেখেছে ভারতের কোন কোন বিলাসবহুল হোটেলে। তাদের মনে হয়েছে এ সব হোটেলে তারা আস্তানা গেড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালে যুব নেতারা এ সব লোকদের দেখেছে তাদের শত্রু হিসেবে। অনিবার্য কারণেই এদের মোকাবেলায় আওয়ামী লীগকে তার যুব শাখা গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে হয়। তারা বুঝতেই

www.pathagar.com

পারেনি যে, তাদের শত্রুদের ভারত সরকার ছেন এত মূল্যায়ন করছে। তারা বিশ্বস্ত সূত্রে আরো জানাতে পারে মার্কসবাদীদের ট্রেনিং দিয়ে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে এবং মাওলানা ভাসানীর দলের লোকদের ও অস্ত্র দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারটা তাদের কাছে খুবই অসহনীয় লাগে এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এ যুব নেতারা কর্নেল ওসমানীকে কোন তথ্য প্রদান করত না। তারা কি করত কি আলোচনা করত তাও কেউ জানত না। তারা গোপনে সব কাজ করতে লাগল।

যুব নেতারা বাংলাদেশের বিস্মৃত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা তাদের সংগঠন থেকে খবর পান যে, কিছু কিছু মুক্তি বাহিনী ইউনিট অবাঞ্ছিত কাজ করছে। কোন কোন ইউনিট লুট করছে, সন্ত্রাসিত করছে সাধারণ মানুষকে। আর অন্যরা ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নিচ্ছে। সকল ধরনের লোক এসেছে মুক্তি বাহিনীতে এবং যোদ্ধা বাহিনী হিসেবে মুক্তি বাহিনী চমৎকার কাজ দেখিয়েছে। কিছু কিছু লোক ছিল নিন্দনীয়। তারাই এ বাহিনীর জন্য চরম দুর্নাম বয়ে আনে। তাই যুব নেতারা দৃঢ়তার সাথে এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, তাদের বাহিনীর গেরিলা নেতা যারা হবে তাদের সকলকেই হতে হবে ব্যক্তিগতভাবে তাদের পারিচিত। মুক্তি বাহিনী থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্যে সে বাহিনীর নাম হবে 'মুজিব বাহিনী'।

এ নামকরণের পক্ষে তাদের যুক্তি হল, মুজিব বাহিনী নামটি বাংলাদেশে পবিত্র বলে বিবেচিত। ফলে কেবল তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকেই নয় সাধারণ মানুষও তাদের সহায়তা করবে। দশ হাজার মুজিব বাহিনী সদস্য ভারতে ট্রেনিং দিয়েছিল।

www.pathagar.com

মুজিব বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনা

১৯৭১ সালের আগস্ট মাস থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিব বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের আসার দু মাস পূর্বেই মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে যায় এবং বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধরত বামপন্থীদের সাথে মিলে মিশে যুদ্ধ করতে থাকে। বৃহত্তর বরিশাল বিভাগের পেয়ারা বাগানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে লিপ্ত হয় মুক্তি বাহিনী সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির যোদ্ধাদের সাথে মিলে। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ১৯৭১ সালে ৭ জুন সর্বহারা পার্টির এক প্রচারপত্রে বলা হয়, পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন প্রতিনিয়ত আওয়ামীলীগ ও তার নেতৃত্বে মুক্তি বাহিনী সকল দেশ প্রেমিক দল ও জনসাধারণের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক পথে সংগ্রাম চালানোর আহ্বান জানায়। বরিশাল জেলার ঝালকাঠির মুক্তি বাহিনী ও আওয়ামী লীগের দেশ প্রেমিকরা এ আহ্বানে সারা দেয়। তাদের অংশগ্রহণ সহ অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের নিয়ে স্থানীয় ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করা হয়।

ঐক্যবদ্ধ মুক্তি বাহিনী তফশিলী হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার বৃহত্তর পেয়ারা বাগান, কুরিয়ানা, ডুমুরিয়া, ভীমরুলী এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে। সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টির যোদ্ধারাই শুধু নয় সকল বাম পন্থীরা শেখ ফজলুল হক মনির কাছে সহযোদ্ধা বলে মূল্য ছিল না। এদের কাছে তারা ছিল শুধু বামপন্থী এবং শত্রুদের চর হিসেবে। কাজেই শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের মূখ্য লড়াই হয়ে দাঁড়ায় বামপন্থী নির্মূল করা। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নয় বরং আগস্ট মাসে শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপ বাংলাদেশে প্রবেশ করেই শুরু করে দেয় বামপন্থী নির্মূল অভিযান। সম্মুখ যুদ্ধে না নেমে তারা বেছে নেয় গুপ্ত হত্যা প্রক্রিয়া। কোথাও নেমে পড়ে সরাসরি লড়াইয়ে। শুধু বামপন্থী নির্মূলই নয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধেও অস্ত্র তুলে নেয় তারা। এমন কি মুজিব বাহিনীর সিরাজুল আলম খান আব্দুর রাজ্জাক, হাসানুল হক ইনু গ্রুপের বামপন্থী চিন্তাচেতনার সহযোদ্ধাদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে।

www.pathagar.com

মুজিব বাহিনী শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের হত্যাকাণ্ডের একটি বিবরণ তুলে ধরছি একটি বই থেকে। বইটির নাম ইন্দিরা গান্ধীর ফাঁসী চাই।

চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার নাপোড়া পাহাড়ে রাতে অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এ মুক্তি যোদ্ধাদের হত্যা করে শেখ ফজলুল হক মণির মুজিব বাহিনীর সদস্যরা। একইভাবে গুপ্ত হত্যার শিকার হন আজকের সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার সৈয়দ কামেল বখত। নেহাত ভাগ্যের জোরে বেঁচে যান তার বড় ভাই সৈয়দ দিদার বখত। সৈয়দ কামেল বখত ছিলেন কাজী জাফর-মেননের কমিউনিস্ট পার্টির সাতক্ষীরা এলাকার নেতা। বড় ভাই দিদার বখত ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত একজন মুক্তিযোদ্ধা।

১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে সৈয়দ কামেল বখত এককভাবে নিজ এলাকায় গড়ে তুলেন গণমুক্তি বাহিনী। জুন মাসের মাঝামাঝিতে নিজের বাহিনী নিয়ে দখল করেন তালা থানা এবং থানা ভবনে সর্ব প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে মুক্তি বাহিনীর সহযোগিতায় আক্রমণ করেন কপিলমুনি থানা। সালতা নদী-পাট কেল ঘাটা ও সাগর দাড়িতে প্রচণ্ড সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে।

আগস্ট মাসে সীমান্ত পেরিয়ে ঐ এলাকায় আসে মুজিব বাহিনীর এক গ্রুপ কমাণ্ডার। সৈয়দ কামেল বখত ও সৈয়দ দিদার বখতের আশ্রয়েই দিন কয়েক অবস্থান করে ভারতে ফিরে যায়। এরপর আবার সে ফিরে আসে মুজিব বাহিনীর কয়েকজন সদস্যের একটি দল নিয়ে। সৈয়দ কামেল বখতের আস্তানায় এসে আশ্রয় নেয়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়। যখন মুক্তি বাহিনী প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে চলছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জোয়ানদের ওপর। সে সময় রাতের অন্ধকারে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে তারা হত্যা করে সৈয়দ কামেল বখতকে। তার সাথে ছিলেন আর একজন মুক্তিযোদ্ধা তার নাম শংকর তাকেও তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। সৈয়দ দিদার বখত ঐ রাতে ছোট ভাইয়ের সাথে ছিলেন না। তিনি বেঁচে গেলেন বটে কিন্তু তাকে তাড়িয়ে ফিরতে থাকে মুজিব বাহিনীর সদস্যরা এবং স্বাধীনতার পরও তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

মুজিব বাহিনী তালা এলাকায় যেভাবে প্রবেশ করে একই পদ্ধতিতে সেপ্টেম্বর মাসে মুজিব বাহিনীর তিনজনের একটি দল প্রবেশ করে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা এলাকায়। আশ্রয় গ্রহণ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বামপন্থীদের শিবিরে। কয়েকদিন পর অস্ত্রসহ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তারা। তাদেরকে বাঁধা দিলে এডভোকেট আব্দুর রবকে হত্যা করে। এডভোকেট আব্দুর রব ছিলেন ঐ এলাকায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুক্তিযোদ্ধা। তারা খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার দুজন বামপন্থীকে হত্যা করে পাকিস্তানী সহায়তায় যেখানে গুপ্ত হত্যার সুযোগ ছিলনা সেখানে ফজলুল হক মণি গ্রুপের মুজিব বাহিনী প্রকাশ্যে নেমে যায় হত্যাকাণ্ডে। পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পাবনার আলাউদ্দিন - মতিনের কর্মীদের বিরুদ্ধে পাবনার শাহপুরে তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে আলাউদ্দিন মতিনের কয়েকজন মুক্তি যোদ্ধা মারা যায়। এরা এপ্রিলের শুরু থেকেই পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। মুজিব বাহিনী প্রকাশ্যে নেমে যায় হত্যাকাণ্ডে। পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। মুজিব বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। বিভিন্ন যায়গায় দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলতে থাকে। নরসিংদীতে প্রচণ্ড রকমের যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত যদি না সেখানকার মুজিব বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা বাঁধা দিত। নরসিংদীতে ফজলুল হক মনি গ্রুপের সদস্যরা দাবি করে মুক্তি বাহিনীকে তাদের অধীনে আসতে হবে। মুক্তি বাহিনী এ দাবি প্রত্যাখ্যান করলে শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের সদস্যরা তাদেরকে বসে আনতে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। কিন্তু প্রবল বাধার মুখে তারা নিরস্ত্র হয়ে বাধ্য হয়।

ফজলুল হক মণির মুজিব বাহিনী শুধু বামপন্থীদের হত্যা করে ক্ষান্ত হয় নি বরং তাদের গ্রুপের মধ্যে অনেককে হত্যার তালিকায় এনে নেয়। যুদ্ধ চলাকালীন দেশের বিভিন্ন এলাকায় দুগ্রুপের মধ্যে গোলা বিনিময় হয়। হত্যাকাণ্ড ঘটাতেও পিছপা হয় না ফজলুল হক মণি গ্রুপ। এ গ্রুপের লোকজন হত্যা করে চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা ১৯৭০ সালে ১২ আগস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রস্তাবের উত্থাপক স্বপন চৌধুরীকে। সে ছিল সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, হাসানুল হক ইনুদের চট্টগ্রাম এলাকার মুজিব বাহিনীর নেতা। যুদ্ধের শেষভাগে স্বপন চৌধুরী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা

www.pathagar.com

পড়ে। ধরা পড়ার আগে যুদ্ধে আহত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার পরিচয় পেয়ে সতর্ক হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহের জন্য তাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলে। রাঙ্গামাটি বন্দর হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা হয়। ১৬ ডিসেম্বরের আগেই রাঙ্গামাটি মুক্ত হয়ে যায়। স্বপন চৌধুরী এ দিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরেও হাসপাতালে ছিল। কিন্তু পরদিন তার কোন খোঁজ পাওয়া না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে স্বপন চৌধুরী ধরা পড়া এবং নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে হাসানুল হক ইনু বলেন, আমাদের বিশ্বাস শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের লোকজন তাকে পাকিস্তানীদের হাতে ধরিয়ে দেয়। তাকে গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়। তার খোঁজ পাওয়া যায় নি। যে নার্স তার চিকিৎসায়রত ছিল সেও ১৯৭২ সালে গায়েব হয়ে যায়। কারণ স্বপন চৌধুরীর নিখোঁজের সংবাদ একমাত্র এ নার্সই অবগত ছিল। এ বিষয়ে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমার কাছে এ রকম একটি খবর এসেছে যে, তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাল্টা শোনা যায় যে, পাকিস্তানীরা তাকে যুদ্ধে আহত হওয়ার পর ধরেছে। ছেলেটি খুব ভাল ছিল। মণি গ্রুপের মুজিব বাহিনীর হত্যা কাণ্ডের নানা বিবরণ বিভিন্ন পত্রিকায় পাওয়া যায় এবং অনেক বইপুস্তকেও এসেছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর এজেন্ট হয়ে যুদ্ধ চলাকালীন শেখ ফজলুল হক মণি এবং তার গ্রুপ বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের নির্মূলে যে অভিযান পরিচালনা করে স্বাধীনতার পর তা সম্প্রসারিত হয় তার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চারতার্থ করার জন্যে নেমে পড়েন অভিযানে। বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনী আওয়ামী যুবলীগ গঠন করা হয়। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার 'র' এর সৃষ্ট মুজিব বাদ নামক অদ্ভূত 'বাদ' প্রতিষ্ঠার শ্লোগানকে করা হয় একমাত্র হাতিয়ার।

নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার পেড়োলী একটি ছোট গ্রাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন এ গ্রামে শ্রেণী শত্রু খতমের নামে কয়েকশ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে আবদুল হকের কমিউনিস্ট পার্টি। আব্দুল হকের কর্মীরাঐ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া অস্ত্র দিয়ে। যে অত্র সরবরাহ করে ছিলেন খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শাহ মোহাম্মদ নাজমুল আলম। ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে খুলনার পতন ঘটলে শাহ মুহাম্মদ নাজমুল আলম শহর ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরে

www.pathagar.com

ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সিরাজুল আলম খান ও কামাল সিদ্দিকীর সাথে মিলে মেহেরপুর আসেন। মেহেরপুরে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের মেজর ওসমান তার বাহিনীর অস্ত্রাগার থেকে এক ট্রাক ভর্তি ৩০৩ রাইফেলস স্টেনগান রকেট লাঞ্চার। গ্রেনেড হালকা মেশিন গান, তুলে দেন তাদের হাতে। পৌছতে হবে পিরোজপুর মেজর জলিলের কাছে। এ দায়িত্ব দেওয়া হল শাহ মোহাম্মদ নাজমুল আলমকে। পথে দেরী হওয়াতে পূর্ব নির্ধারিত টেকের হাট থেকে পিরোজপুরগামী লঞ্চ না পাওয়া গোপালগঞ্জগামী একটি লঞ্চে ওঠে পড়েন অস্ত্র নিয়ে। এবং সেখানে পৌছে অস্ত্র তুলে দেন প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্যের হাতে। আটটি স্টেনগান্ চার বাক্স গ্রেন্ডে ও একটি রকেট লাঞ্চতার রেখে দেন নিজ এলাকা পেড়োনীতে প্রতিরোধ ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্যে। পেড়োনী পৌছে নাজমুল আলম সেখানকার একজন পীরসাহেবের ছেলে নিয়াজ আহমদ নিয়াজীর হাতে তুলে দেন সেসব অস্ত্র। নিয়াজ আহমদের সাথে নাজমুল আলমের পরিচয় ছিল আগেই। তাকে তিনি প্রগতিশীল বলে জানতেন। তিনি জানতেন না যে নিয়াজ আহমদ আব্দুল হকের শ্রেণী শত্রু খতম দলের লোক। যদি তা জানতে পারতেন তবে অস্ত্র দিতেন না। নাজমুল আলম অন্য যায়গায় চলে যায়।

এ এলাকায় ডাঃ সাইফ-উদ-দাহারের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাথে মিলে যৌথ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। নিয়াজ আহমদ ও তার নেতা কায়সার শিকদারও নিজের কর্মী বাহিনী সাথে নিয়ে এসে যোগ দেয় যৌথ প্রতিরোধ কমিটিতে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে ঐ গ্রামে আসে আব্দুল হক। সেখানে সে কয়েকদিন অবস্থান করে। এলাকা থেকে আবদুল হক চলে যাওয়ার পর নিয়াজ আহমদ ও কায়সার শিকদার তাদের কর্মীদের নিয়ে প্রতিরোধ কমিটি ছেড়ে চলে যায় এবং শুরু করে দেয় শ্রেণী শত্রু খতমের নামে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা। এ সময় ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর একটি দল কামউনিস্ট কর্মী সংঘ ও আওয়ামী লীগ যৌথ বাহিনীতে এসে যোগ দেয় এবং তাতে এদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। পেড়োল ইউনিয়ন আব্দুল হকের বাহিনী যা নিয়াজ আহমদ ও কায়সার শিকদার পরিচালনা করছিল। তাদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে ভীত সাধারণ মানুষ

www.pathagar.com

যৌথ বাহিনীর কাছে ছুটে আসে প্রাণ বাঁচানোর আবেদন দিয়ে। যৌথ প্রতিরোধ বাহিনী আব্দুল হকের বাহিনীর ওপর প্রথম আঘাত হানে আগস্ট মাসে। কিন্তু সে আক্রমণ ব্যর্থ হয়। সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি বাহিনীর নতুন আর একটি দল এসে যোগ দেয় যৌথ প্রতিরোধ কমিটিতে। এ যৌথ বাহিনী অক্টোবর মাসে চূড়ান্ত আঘাত হানে আবদুল হকের বাহিনীর ওপর এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণ ও এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। ডাঃ সাইদ উদ-দাহার বলেন আমারই প্রস্তাব মতে পেড়োনীর পাশের গ্রাম খড়লিয়ায় গঠিত হয় যৌথ প্রতিরোধ কমিটি। আমরা জুলাই মাস পর্যন্ত একসাথে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। জুলাই মাসে পেড়োনী গ্রামে আব্দুল হকের সফরের পর পরই নিয়াজ আহমদ ও কায়সার শিকদার যৌথ প্রতিরোধ কমিটি ত্যাগ করে চলে যায়। নেমে পড়ে শ্রেণীশত্রু খতমের নামে সাধারণ মানুষ হত্যার কাজে। তাদের এ হত্যাকাণ্ড রোধের আবেদন আমাদের কাছে ছুটে আসে স্থানীয় অধিবাসীরা। তাই যৌথ প্রতিরোধ বাহিনীকে নামতে হয় শ্রেণী শত্রু খতমকারীদের বিরুদ্ধে। অক্টোবর মাসে সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষার জন্য তাদের উৎসাহে সফল অভিযান চালানো হয়। তারা আত্মসমর্পণ করে এবং তাদেরকে এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। উপরের এ ঘটনা বর্ণনার কারণ হলো স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন চলছিল। সে সময় মুজিব বাহিনী যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে তার সাথে আব্দুল হকের বিপ্লবী বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের মূলগত কোন পার্থক্য নেই। তবে এরা হত্যা করেছে সাধারণ মানুষকে আর ফজলুল হক মণির মুজিব বাহিনী হত্যা করেছে র এর প্ররোচনায় তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মুক্তি বাহিনীদেরকে।

www.pathagar.com

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং মুজিব বাহিনী

২৫ মার্চের পর শুধু যুদ্ধ প্রস্তুতিই নয়, যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্য যাতে বজায় থাকে, সে পরিকল্পনা তৈরির প্রস্তুতি নেয় ভারত সরকার। এ পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর ওপর। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বাধীনে বাংলাদেশের জনসাধারণ যখন মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত, মুক্তিবাহিনীর আকুতোভয় যোদ্ধারা যখন জীবনবাজি রেখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামান আর মেশিন গানের মুখোমুখি অবস্থান করছে, তখন 'র' অবস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অজ্ঞাতে উত্তর ভারতের দেরাদুনের কাছাকাছি তানদুয়ায় গড়ে তুলতে থাকে তার নিজস্ব বাহিনী। সে বাহিনীর নাম দেওয়া হয় মুজিব বাহিনী।

যুদ্ধ প্রস্তুতি, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও মুক্তিবাহিনীর সহায়তাদান সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত সরকার তিনটি কমিটি গঠন করে। একটি রাজনৈতিক এবং অপর দুটি সামরিক। ভারত সরকার এবং অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে রাজনৈতিক কমিটি। এ কমিটির প্রধান করা হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্লানিং কমিশনের চেয়ারম্যান ডি. পি. ধরকে। আর যুদ্ধ প্রস্তুতি সংক্রান্ত যুদ্ধ কাউন্সিলের প্রধান করা হয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশকে। জেনারেল মানেকশ সেনাবাহিনী উপপ্রধানকে চেয়ারম্যান করে আরেকটি কমিটি তৈরি করেন। সেটা যুগ্ম গোয়েন্দা কমিটি। কমিটিতে 'র'-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও সেনাবাহিনী উপপ্রধানকে করা হয় এর চেয়ারম্যান কিন্তু জেনারেল শ্যাম মানেকশই থাকেন চূড়ান্ত নির্দেশদানের অধিকর্তা। যুগ্ম গোয়েন্দা কমিটি যুদ্ধ প্রস্তুতিতে তার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী তরুণদের নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠনের পরিকল্পনাতে নেমে পড়ে। পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করে তোলার দায়িত্ব পড়ে তার অঙ্গ সংগঠন 'র'-এর ওপর। এই বাহিনী গঠনে ডেকে পাঠান হয় বিশেষ বাহিনী তৈরিতে পারদর্শী মেজর জেনারেল উবানকে। তিনি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে লেগে যান। কাজটি তার জন্য সহজ হয়ে গেল তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমসন্ত্রী হবার

www.pathagar.com

কারণে। তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আওয়ামীলীগের চার যুবনেতা। তাদের ক্ষোভের সুযোগ নেয়া হল। যদিও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আগে থেকে, অন্যভাবে এবং এর ফলে গড়ে ওঠে মুজিববাহিনী।

জেনারেল উবান তার যাবতীয় নিষ্ঠা প্রয়োগে গড়ে তুলতে থাকেন মুজিববাহিনীকে। তিনি এর গঠন প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রমের জন্য দায়ি থাকেন সরাসরি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশর কাছে। এ কারণে তার বাহিনী এক সময় 'শ্যাম মানেকশর ছেলেরা' নামে পরিচিতি লাভ করে। মেজর জেনারেল উবান মুজিববাহিনীর ব্যাপারে দায়ি ছিলেন সরাসরি জেনারেল মানেকশ আর 'র'-এর ডিরেক্টর আর এন কাওয়ের কাছে– যিনি ছিলেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি; তার বেসামরিক ওপরঅলা। জবাবদিহি মাত্র দু'জনের কাছে করতে হত বলেই তিনি নির্দ্বিধায় ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরার অজ্ঞাতে তার বাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেদের পাঠাতে শুরু করেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। এতে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডে তৈরি হয়ে যায় দ্বৈত অধিনায়কত্ব এবং স্বাভাবিক কারণেই জেনারেল আরোরার কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবার কথা নয়। তিনি সেনাবাহিনী সদর দফতরকে বলেন, মুজিববাহিনীকে তার অধিনায়কত্বে ছেড়ে দিতে। তার অনবরত চাপে ডাইরেক্টর অব মিলিটারি অপারেটর্স লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে. কে. সিং মুজিববাহিনীর তাৎপর্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তাজউদ্দীন আহমদ যখন মুজিববাহিনীর অস্তিত্বের কথা জানতে পান, তখন তিনিও জেনারেল শ্যাম মানেকশকে অনুরোধ জানান এ বাহিনীকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বাধীন ছেড়ে দিতে। জেনারেল মানেকশ তাকে জানান যে, সেনাবাহিনীর বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তৈরি করা হয়েছে এ বাহিনী। কিন্তু কী সে দায়িত্ব, সে সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদকে তিনি কী বলেছিলেন, তা জানা যায় নি। সাত দফা গোপন চুক্তির আলোকে এ বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য অনুধাবনে বেগ পাবার কথা নয়। তা হল, মুক্তিবাহিনীর এক বিরাট সংখ্যক সদস্য বামপন্থী চিন্তাধারায় সিক্ত। স্বাধীনতার পর এরা ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এ চিন্তা থেকে এদেরকে নির্মূলের লক্ষ্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি অজ্ঞাবহ বাহিনীর। আর সে বাহিনী গড়ে উঠবে শেখ মুজিবের নামে এবং মুজিবের

www.pathagar.com

রাজনীতির নামে সে বাহিনী পরিচালিত হবে বামপন্থী নির্মূলে। তবে মুজিববাহিনী তৈরি করে 'র' যা করতে চেয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে ঘটে যায় বিপরীত। কারণ মুজিববাহিনীর ভেতরই সমাজতন্ত্র বিরাজমান ও বামপন্থী চিন্তাধারার অনুবর্তী ছিল শতকরা আশি ভাগ।

মুজিববাহিনী কাদের নিয়ে গঠিত হয়, কি উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়, এ সবই জানা গেছে জেনারেল উবানের কাছ থেকে। মুজিববাহিনী নেতা চতুষ্টয় সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদের সাথে কোথায়, কার মাধ্যমে তার প্রথম পরিচিতি ঘটে, তা তিনি বলেন নি। শুধু বলেছেন এক বন্ধুর বাড়িতে তাদের প্রথম দেখা ও বৈঠক হয়। কিন্তু তার সে বন্ধু যে চিত্তরঞ্জন সুতার, এ নামটি ভুলেও তিনি বলেন নি। তিনি চিত্তরঞ্জন সুতারের নামটি উচ্চারণ না করলেও আব্দুর রাজ্জাক তা বলেছেন। পরিষ্কার হয়ে যায় 'র'-এর সঙ্গে জেনারেল উবান ও মুজিববাহিনীর যোগসূত্রটি। এবার আবদুর রাজ্জাক এর বক্তব্য শোনা যাক।

আব্দুর রাজ্জাক এক সাক্ষাৎকারে বলেন: "জায়গা মত গিয়ে দেখি যে, শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ।... সে জায়গাটা কলকাতায় ২১ নম্বর রাজেন্দ্র রোড; যেখানে চিত্তরঞ্জন সুতার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।..... তিনি ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ করলেন। সেই আলাপের প্রেক্ষিতে একজন অফিসার আসেন। জেনারেল উবানই এসেছিলেন।"

আব্দুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎকারেই দেখা যায় পাব কী নিপুণ কৌশলে চিত্তর ন সুতার এ চারজনকে তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রী হবার ঘটনাকে অজুহাত করে ঐক্যবদ্ধ করেন। যুবনেতা চতুষ্টয় মনে করতেন, –যেহেতু আওয়ামীলীগের ভেতর ছাত্রলীগের তরুণরাই হচ্ছে বেশিরভাগ; আর তাদের নেতৃত্বে আছেন তারাই সেহেতু মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেবার কথা তাদেরই, মাঝখান দিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করে তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী হয়ে নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেবেন, এ তাদের মোটেই কাম্য ছিল না। চিত্তর ন সুতার এটাকে উস্কে দেন এভাবে: "আপনাদের ভেতর মত পার্থক্য কেন হচ্ছে? আপনারা এক থাকেন। সরকারের সঙ্গে কথা বলেন, সরকার তো আপনাদেরকেই চেনে।"

যুবনেতা চতুষ্টয় চিত্তরঞ্জন সুতারের এ আশ্বাসের প্রেক্ষিতে তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রিত্বের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে যুদ্ধ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব

www.pathagar.com

তোলেন। তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করবে যুদ্ধ কাউন্সিল। কেননা, তাদের মতে, মুক্তিবাহিনীতে ঢুকে যাচ্ছে এমন সব লোক যারা যুদ্ধ অনাগ্রহী এবং পাকিস্তানপন্থী। জেনারেল উবানের ভাষ্য অনুযায়ী "বামপন্থী ও নকশালপন্থী নৈরাজ্যিকরা।" কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। আর অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রশ্নে ভারত সরকারকে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রেও তারা হতাশ হন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আরো বেশি মাত্রায়। অতএব, বিকল্প হিসেবে নিজেদের নেতৃত্বে একটি সমান্তরাল বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নামেন এবং চিত্তরঞ্জন সুতার সে ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলেন। প্রকাশ হয়ে যান মেজর জেনারেল উবান।

মেজর জেনারেল উবানের সাথে চার যুবনেতার সাক্ষাতের দু'সপ্তাহের মাথায় মুজিব বাহিনীর প্রথম দলটি ভারতীয় মিলিটারি একাডেমী শহর দেরাদুন থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের চূড়ার শহর তানদুয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। প্রশিক্ষণ শুরু হয় ১৯৭১ সালের মে মাসের ২৯ তারিখে। আরেকটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয় মেঘালয়ের চূড়ার কাছাকাছি জাফলং-এ। মাত্র একটি দলের ট্রেনিং শেষে এ ক্যাম্পটি তুলে দেয়া হয়। তানদুয়ার ট্রেনিং ক্যাম্পের মূল পরিকল্পক ও পরিচালক ছিলেন মেজর জেনারেল উবান।

প্রথম দলটি, যার সংখ্যা ২৫০, তাদের ট্রেনিং দেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসাররা। ট্রেনিং শেষে এদের ভেতর থেকে ৮ জনকে করা হয় প্রশিক্ষক। হাসানুল হক ইনুকে করা হয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধান। প্রশিক্ষকরা হলেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া, আ. ফ. ম মাহবুবুল হক, রফিকুজ্জামান, মাসুদ আহমদ রুমী, সৈয়দ আহমদ ফারুক, তৈফিক আহমদ ও মোহনলাল সোম। পরে প্রশিক্ষকের সংখ্যা বাড়ান হয়। করা হয় বাহান্ন জন। এরাই বাকি দশ হাজার মুজিববাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার। আর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রধান হাসানুল হক ইনুর ওপরঅলা ছিলেন একজন কর্নেল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অন্যান্য ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মেজর মালহোত্রা।

মুজিববাহিনীর অপারেশন পরিচালনার জন্য চার যুবনেতা বাংলাদেশকে চারটি সেক্টরে ভাগ করে নেন। বৃহত্তর রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর নিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টর -এর দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান।

www.pathagar.com

সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন মনিরুল ইসলাম ওরফে মার্শাল মণি। বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল এবং পটুয়াখালী নিয়ে গঠিত দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টর,-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তোফায়েল আহমদ। সেকেন্ড ইন-কমান্ড ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট এবং ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টর। শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন এ সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সেকেন্ড-ই-কমান্ড ছিলেন আ. স. ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। আর কেন্দ্রীয় সেক্টর ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল এবং ঢাকা জেলার কিছু অংশ নিয়ে দফতর ছিল। মেঘালয়ের ডালুতে। এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন সৈয়দ আহমদ।

চার যুবনেতা সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদের ওপর ছিল মুজিববাহিনীর কর্মী সংগ্রহের দায়িত্ব। ছাত্রলীগ কর্মী এবং শেখ মুজিবের কট্টর অনুসারী ছাড়া বাইরের কারোরই মুজিববাহিনীতে প্রবেশাধিকার ছিল না। মুজিব বাহিনীর জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং ব্যয় নির্বাহে আর্থিক সহায়তার সমন্বয় বিধান করতেন জেনারেল উবান। তার মাধ্যমেই অস্ত্র এবং বাজেট অনুযায়ী অর্থ সরাসরি চলে আসতো চার যুবনেতার হাতে। দেয়া হত সেক্টর ভিত্তিক। চার যুবনেতা পেতেন জেনারেলের মর্যাদা। যাতায়াতের জন্য পেতেন হেলিকপ্টর।

২৫ মার্চের আগে শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের ভেতর স্বাধীনতার প্রশ্নে যে মতবিরোধ ছিল, ভারতের মাটিতে পা দেয়ার পর তার অবসান ঘটে। কিন্তু মুজিববাহিনী গঠনের শুরু থেকে আরেকটি বিরোধ অংকুরিত হতে থাকে– সেটা যেমন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, তেমনি মতাদর্শগত বিরোধ এবং এক সময় বিরোধ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তাদের এই বিরোধের প্রথম দেখা যায় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৭০ সালের ১২ আগস্টের বৈঠকে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রস্তাব গৃহীত হবার সময়। ছাত্রলীগের যে গ্রুপটি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, তার প্রকাশ্য নেতা ছিলেন নুরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল কুদ্দুস মাখন পেছনের শক্তি ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি।

www.pathagar.com

শেখ ফজলুল হক মণি তখন ছাত্র ছিলেন না ঠিকই, বৃহত্তর রাজনীতিতে প্রবেশের চেষ্টায় ছিলেন, তবে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নিজের মুঠোয় রাখার প্রয়াস থেকে দূরে ছিলেন না। অপর গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। তার স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ডাক-এর প্রতি ছাত্রলীগের বেশির ভাগ তরুণ ঝুঁকে পড়লেও সমাজতন্ত্রের প্রতি সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিগত বিশ্বস্ততার প্রশ্নটি সংশয়ের ঊর্ধ্বে রাখা যায় না আব্দুর রাজ্জাকের ভাষ্য অনুযায়ী। আবার সমাজতন্ত্রকে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থে ব্যবহার করেছিলেন কিনা, এ প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বলার অবকাশ রয়ে যায় যে, ২৫ মার্চের আগে সিরাজুল আলম খান ও শেখ ফজলুল হক মণির ভেতর যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল, সেটা ছিল একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব এবং সমাজতন্ত্রের শ্লোগান তুলে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বকে সুকৌশলে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বে রূপ দিতে পেরেছিলেন সিরাজুল আলম খান। ভারতের মাটিতেও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ প্রতিষ্ঠার পুরোনো দ্বন্দ্বটি ঢাকা পড়ে যায় তথাকথিত মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের আড়ালে।

সিরাজুল আলম খান ভারতে যতদিন ছিলেন যুদ্ধে তিনি (সিরাজুল আলম খান) তো যানই নি, কলকাতাতেই অধিকাংশ সময় ছিলেন। ওখানে তার যে ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন শিলিগুড়ির পাংগা ক্যাম্প, তার ইনচার্জ ছিলেন মনিরুল ইসলাম ওরফে মার্শাল মণি এবং মান্নানকে দায়িত্ব দিয়ে কলকাতাতেই থাকত। কলকাতায় কোথায় কি করতেন, কাউকে জানতে দিতেন না। পরবর্তীকালে খবর পাওয়া গেল তিনি নকশালদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এসইউসির'র সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার : নেতা শিবদাশ ঘোষের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, যিনি দক্ষিণপন্থী লবির লোক, তার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল সিরাজুল আলম খানের। মোটিভটা ধরা পড়েছে অনেক পরে যখন দেখা গেল পিটার কাসটারর্সের সাথে তার সংযোগ, যখন দেখা গেল পশ্চিম বাংলা অতি বামপন্থীদের সাথে তার যোগসূত্র রয়েছে, যাদের সঙ্গে ট্রটস্কীপন্থী আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের যোগাযোগ, যারা সিআইএ অরগানাইজড। তাদের সাথে তার সম্পর্ক দেখা গেল। পরবর্তীকালে তখন বুঝা গেল তিনি একটা মটিভ নিয়ে কাজ করছেন। আর ট্রটস্কী লাইন সম্পর্কে আমার তো পরিষ্কার ধারণা আছে, এতো সিআইএ-র লাইন।" অতএব, এক প্রকার স্পষ্ট যে বারতের মাটিতে মুজিববাহিনীর দু'নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাসী দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে মতাদর্শগত বিরোধ প্রকাশের মধ্য

www.pathagar.com

দিয়ে। একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান সিরাজুল আলম খান ব্যবহার করলেও ছাত্রলীগের প্রায় আশিভাগ তরুণ কিন্তু বামপন্থী চিন্তাধারার অনুবর্তী হয়ে পড়ে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সৎনিষ্ঠাবান যোদ্ধায় পরিণত হয়ে যায় যা আবার সিরাজুল আলম খানেরই নেতৃত্বকে দৃঢ়তর করে। অপরদিকে শেখ মুজিবের প্রতি আব্দুর রাজ্জাকের গভীর আনুগত্য সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের প্রতি তার বিশ্বস্ততা মুজিববাহিনীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী তরুণদের ভেতরেও তার নেতৃত্বকে সমভাবে প্রোথিত করে। আবার শেখ মুজিবরে প্রতি আনুগত্যের কারণে শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের সদস্যদের কাছেও ছিলেন সমান শ্রদ্ধাভাজন। ফলে ভারতের মাটিতে তাকে শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে হয়। অন্যদিকে মুজিববাহিনীর নেতৃত্বে একাধিপত্য অর্জনের চেষ্টায় সতর্ক পদক্ষেপে নেমেও ব্যর্থ হতে হয় শেখ ফজলুল হক মণিকে। ব্যর্থ হন এ কারণে যে, তানদুয়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যারা প্রশিক্ষক ছিলেন তাদের নেতৃত্বে ছিলেন হাসানুল হক ইনু। তিনি বামপন্থী চিন্তাধারার অনুবর্তী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী। প্রথম দলের ট্রেনিং শেষে যে আটজনকে প্রশিক্ষক করা হয়, তাদের মধ্যে একজন বাদে আর সকলেরই চোখে ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। প্রশিক্ষকের সংখ্যা যখন বায়ান্নতে উন্নীত হয়, তখনো বামপন্থী অনুবর্তীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিনজন বাদে আর সকলেই ছিলেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী। স্বাভাবিক কারণেই প্রশিক্ষকদের রাজনৈতিক মটিভেশন সমাজতন্ত্রের পক্ষেই হবার কথা। যেহেতু আওয়ামীলীগের ঘোষণাপত্রে সমাজতন্ত্রের কথা ছিল, সে কারণে সমাজতন্ত্রের ওপর রাজনৈতিক বক্তৃতা রাখা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। কিন্তু বিষয়টিকে মোটেই সহজভাবে নেয় না তানদুয়ার ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ। প্রশিক্ষণ প্রধান হাসানুল হক ইনুর ওপরঅলা ভারতীয় কর্নেল রাজনৈতিক বক্তৃতা বন্ধের নির্দেশ দেন। এ আদেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে প্রশিক্ষকরা দাবি তোলেন যে সরাসরি দিল্লী থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তারা সামরিক প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি রাজনৈতিক বক্তৃতাও চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কর্নেলের অনবরত চাপে পরিস্থিতি এক পর্যায়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষণ প্রধান হাসানুল হক ইনু কর্নেলকে জানিয়ে দেন যে, দিল্লী থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি যতদিন না আসছে ততদিন ট্রেনিং বন্ধ থাকবে। প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণদান বন্ধ করে দিলেন। এ খবর দিল্লীতে

www.pathagar.com

পৌঁছতে তানদুয়ার ছুটে আসেন জেনারেল উবান। চার যুবনেতাও এলেন তার সঙ্গে। আসল সত্যটা এড়িয়ে গিয়ে কৌশলে অচলাবস্থার নিরসন ঘটান হয়। ট্রেনিং প্রদান আবার আরম্ভ হয় এবং রাজনৈতিক বক্তৃতাও চলতে থাকে। প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণদান বন্ধ রাখেন তিনদিন। ২০ নভেম্বর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হলেও সামজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনায় প্রভাবিত থাকার কারণেই প্রশিক্ষকদের ১৬ ডিসেম্বরের আগে তানদুয়া থেকে ছাড়া হয় না।

রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রশিক্ষণ বন্ধের ঘটনা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-কে মুজিববাহিনীর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা এনে দেয়। 'র' হিসেব কষে ফেলে, যে পরিকল্পনাকে সামনে রেখে মুজিববাহিনী করা হচ্ছে তা অংকুরেই বিনষ্ট হতে যাচ্ছে এবং আশ্রয় নেয় ভিন্ন কৌশলের। আত্মপ্রকাশ ঘটে এক অদ্ভূত মতাবাদের-নাম তার মুজিববাদ!

১৯৭১ সালের মে মাসের ২৯ তারিখে তানদুয়ায় মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং শুরু হলেও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার এর অস্তিত্বের খবর জানতে পায় আগস্ট মাসে। এ মাস হতেই সীমান্তে মুক্তিবাহিনী কমান্ড ও ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী কমান্ডের অগোচরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজিববাহিনী সদস্যরা বাংলাদেশ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিবাহিনী কমান্ড ও ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তারা ধরা পড়ে। প্রয়াত মুক্তিবাহিনী কমান্ড ও মেজর জলিলের সেক্টরে মুক্তি বাহিনী সদস্যদের হাতে ধরা পড়ে বাইশজন মুজিববাহিনী সদস্য। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে মেজর জলিল বলেন: "আমার সেক্টরাধীন হিঙ্গেলগঞ্জের ফিল্ডে যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তারা বাইশজনকে গ্রেফতার করেন। তারা তখন ভেতরে প্রবেশ করছিল। সেখানে তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়। এক ভদ্রলোক নিজেকে ক্যাপ্টন জিকু বলে পরিচয় দেন। তাকে গ্রেফতার করা হয়।" এ ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। এর প্রেক্ষাপটে কলকাতার হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক। ভারত সরকারের পক্ষে ছিলেন ডি. পি. ধর। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারে পক্ষ থেকে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। আর ছিলেন মুজিববাহিনীর নেতারা। সেপ্টেম্বর মাসেও অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি বৈঠক। প্রথম বৈঠকেই একটি আপোস রফা হয়ে যায়। শাহজাহান সিরাজকে মুজিব বাহিনী ও অস্থায়ী সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নিয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

মুজিববাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই শাহজাহান সিরাজ এ নিয়োগ লাভ করেন। অবশ্য এ নিয়োগকে সিরাজুল আলম খানের রহস্যজনক কার্যকলাপের আরেকটি দিক হিসেবে উল্লেখ করে আব্দুর রাজ্জাক বলেন যে, তিনি তাজউদ্দিন আহমদের সাথে গোপন আঁতাত রাখার জন্য শাহজাহান সিরাজের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

অগাস্ট মাসে মুজিববাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা শুরু করলেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে নামার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। আব্দুর রাজ্জাক ও হাসানুল হক ইনু বলেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা নেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি থানায় একজন করে কমান্ডারের অধীনে দশজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজিববাহিনী সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমান্ড গঠন করা হয়। তাছাড়া ছিল একজন রাজনৈতিক কমান্ডার। রাজনৈতিক মটিভেশন প্রদানই ছিল তার কাজ। একই পদ্ধতিতে গঠন করা হয় জেলা কমান্ড। জেলাতেও ছিল রাজনৈতিক কমান্ডার। থানা কমান্ড ও জেলা কমান্ড গঠিত হলেও যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তা করেনি মুজিববাহিনীর সদস্যরা। তারা যা করে, সে ব্যাপারে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "আমরা জনগণের সাথে মিলে যুদ্ধ করছি। পাক আর্মির সামনে না পড়লে যুদ্ধ করছি না। দু'চার জায়গায় সামনে পড়ে গেছি–যুদ্ধ হয়েছে। আমার তো লড়াই শুরুই করি নি। আমাদের তো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঁচ বছরের প্রথম বছরে কি করব, তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে কি করব তারপর সরকার তৈরি করব, এই ছিল আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমরা যদি সফল হতাম তাহলে কোন ঘাস থাকত না, আগাছা থাকত না। সমাজ দেহ থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতাম। প্রতিবিপ্লবীদের থাকতে হত না। হয় মটিভেট হয়ে এদিকে আসতে হত নইলে নিশ্চিহ্ন হতে হত।" আব্দুর রাজ্জাক এর মুখ থেকেই এসে গেছে 'র'-এর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ছক। অবশ্য আব্দুর রাজ্জাক এ কথা বলেছেন তাঁর বামপন্থী চিন্তাধারার আলোকে। তাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বামপন্থী চিন্তাধারার অনুবর্তী এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী তরুণদের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতাই পরবর্তীকালে 'র'-কে তার পরিকল্পনা কার্যকর করতে দেয় নি। আব্দুর রাজ্জাক, হাসানুল হক ইনুরা পরিকল্পনা মাফিক এগুতে পরেনি সত্য কিন্তু শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের মাধ্যমে 'র' নেমে পড়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান 'র'- 'সিআই'এর মুখোমুখি

ভারতের মাটিতে যে উদ্দেশ্যে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয় তা ধ্বংস করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের সাথে যে সাত দফা গোপন চুক্তি সম্পাদন করে, তাতে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যে, আধাসামরিক বিশেষ বাহিনী গঠনের ধারা সন্নিবেশিত হয়, সে বাহিনীই হচ্ছে সে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। আর সে বাহিনী হচ্ছে রক্ষী বাহিনী।

রক্ষী-বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র দুটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করে ফেলে। এক, কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী যারা ভারতে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদেরকে এবং দুই. তার মার্কিনপন্থী প্রতিপক্ষকে তারা মুক্তি যোদ্ধা হোক বা না হোক তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ২৫ দিন পর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পাকিস্তানের জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। ক্ষমতায় আরোহন করার পর পরই যে বিষয়টির প্রতি তিনি বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন তা হল- প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা। আর তার প্রতিপক্ষ হচ্ছে বামপন্থীরা। এ বিষয়ে ফ্রান্সের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত তার সাক্ষাতকার দেখা যেতে পারে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে কোন এক সময় ফ্রান্সের দৈনিক পত্রিকায় তার দেয়া এক সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চে। সাক্ষাতকারে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান সরকার কি এটা বুঝেন না যে, আমিই হলাম একমাত্র লোক যে পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউ নিজমথেকে রক্ষা করতে সক্ষম। যদি তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন তবে আমি ক্ষমতাচ্যুত হব এবং আমার নামে নকশালরা নেমে পড়বে। যদি বেশি ছাড় দেই আমি কতৃত্ব হারাব। মুশকিলে আছি আমি। কাজেই লক্ষ্য অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কায়িকভাবে বিনাস করা সম্ভব সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি বাহিনীকে ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য সাধনে সেনা বাহিনীকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা ছিল অন্যখানে। প্রথমত সেনা বাহিনী তখনো

www.pathagar.com

রয়েছে অসংগঠিত। উপরন্তু সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য অংশ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োগ, ভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হবে এবং সে জটিলতা অবশ্যই রাজনৈতিক। কাজেই প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে একটি বাহিনীর প্রয়োজন। যা কোন রাজনৈতিক চেতনায় সিক্ত নয়। এ কারণেই মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে অস্থায়ী সরকার বাতিল করে তারই নেতৃত্বে জাতীয় বিপ্লবী সরকার গঠন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক শক্তিকে এই সরকারে যোগদানের আহবান জানায়। শেখ মুজিবুর রহমান তা নাকচ করে দেন।

বিপ্লবী সরকারের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবার পর স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আরো ছয়টি প্রস্তাব দেয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। এক, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহকারী সকল দল ও মতের প্রতিটি মুক্তি যোদ্ধাকে সরকারি ঘোষণা বলে অস্ত্রসহ ক্যাম্পে একত্রিত করে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং সরকারিভাবে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। দুই. পাকিস্তান ও বৃটিশের ছেড়ে যাওয়া ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পরিবর্তে নতুন প্রশাসনের অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে তাদেরকে মেধা অনুযায়ী কাজে লাগাতে হবে। এদের যারা স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনে আসতে চায় তাদেরকে মেধা অনুযায়ী সুযোগ করে দিতে হবে। তিন. মুক্তি যোদ্ধাদের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে। তবে সে বাহিনী প্রচলিত বাহিনীর মত হবে না। এ বাহিনী হবে জনগণের বাহিনী। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুর্নগঠনে তাদেরকে নিয়োগ করতে হবে। চার. অস্থায়ী সরকার ও আওয়ামীলীগের এম, এন, এ ও এম পি, এ যারা ভারতে অবস্থানকালে দুর্নীতি করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। গণবিরোধী মুক্তি যুদ্ধ বিরোধী কাজ করেছে, তাদেরকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করতে হবে এবং ট্রাইবুনাল গঠন করে বিচার করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ যারা জীবনপণ করে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, তাদেরকে আওয়ামীলীগে আসার আহ্বান করতে হবে। পাঁচ, সরকার প্রধান নয় দলীয় প্রধান হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের বাইরে থেকে সরকারের ভুল-ভ্রান্তিকেই শুধু দেখিয়ে দেবেন না বরং তা নিরসনে নির্দেশ প্রদান করবেন এবং দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। ছয়.

www.pathagar.com

বিভিন্ন দেশ থেকে যে বিপুল সাহায্য আসছে তা দেশ পুনর্গঠনে ও গন-শিক্ষার কাজে ব্যয় করতে হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন না। কারণ প্রস্তাবের মধ্যে তিনি দেখেন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এমন এক দেশপ্রমিক তরুণসমাজকে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং মুজিব বাহিনীর মধ্যে তারাই বেশি সংখ্যক কাজেই এ প্রস্তাব বাতিল হবারই কথা। একই সময়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল দাবি তোলে। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে যে সব দল তাদেরকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান তাদের দাবি মানলেন না। কাজেই এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম করেছেন। জেলজুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন তিনি এ গণতান্ত্রিক দাবি মানলেন না কেন? এটা কেমন মানষিকতা।

আসলে গণতান্ত্রিক সহনশীলতার কথা তার মুখে উচ্চারিত হলেও এক আশ্চর্য রকমের আধিপত্যকামী মানসিকতা সব সয়ই তার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। এ ধরনের মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারেন না। অন্যের অবদানেরও স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। যেমন ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ কর্তৃক আইয়ুব খান আহূত লাহোর গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে প্যারোলে যেতে রাজি হয়ে যান। তখন একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে অনিবার্য রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করেন। অথচ এর পুরো কৃতিত্ব দিয়েছেন তার স্ত্রী ফজিলাতুন নেছাকে। শেখ মুজিবুর রহমান এ রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধারে কর্মকর্তার নাম তিনি কারো কাছে না বললেও পাকিস্তানের সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী জি. ডব্লিউ চৌধুরীর কাছে স্বীকার করেছেন। এ গোয়েন্দা কর্মকর্তা ছিলে এ, বি, এস সবদার। স্বাধীনতার পর তিনি রাষ্ট্রপতির পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন টিমের প্রধান নিযুক্ত হন।

শেখ মুজিবুর রহমান করাচিতে অনুষ্ঠিত আইয়ূব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যেতে রাজি হলেন কেন? কিভাবে এ বি, এস, সফদার তাকে রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়ে তুললেন। ঢাকা সেনানিবাসের বন্দিথানায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আইয়ুব খানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এডমিরাল এ

www.pathagar.com

আর খানর সাথে তিন ঘণ্টাব্যাপী যে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তার মূল বিষয় ছিল পাকিস্তানের পরবর্তী সরকার হবে পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক শেখ মুজিবুর রহমান হবেন সে সরকারের প্রধানমন্ত্রী আর আইয়ূব খান হবেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান। শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া দুটি শর্ত-তার ঘনিষ্ট বন্ধু শিল্পপতি ইউসুফ হারুণকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর আর ড. এম. এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হবে। যা কয়েকদিন পরই কার্যকর হয়ে যায়। এ বিষয়ে এম. এন, হুদার বর্ণনাতে শোনা যাক তিনি কি বলেছেন। এম. এন হুদা বলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান উঠেছিলেন ইস্ট পাকিস্তান হাউজে। আমিও তখন সেখানে ছিলাম। আমার সাথে দেখা হতেই তিনি বললেন, আপনি এখানো এখানে? আপনি দ্রুত ঢাকায় গিয়ে মোনায়েম খানের কাছ থেকে গভর্নরের দায়িত্ব বুঝে নিন। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এ. আর খানের বৈঠকের পরই প্রকাশ হয়ে পড়ে শেখ মুজিবুর রহমান প্যারোলে মুক্তি নিয়ে লাহোরে যেতে সম্মত হয়েছেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়া মাত্রই সারা পূর্ব পাকিস্তানে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হতে থাকে। এ সময় গোয়েন্দা কর্মকর্তা এ বি.এস সবদার শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী ফজিলাতু নেছার কাছে ছুটে যান। তাকে বলেন, আইয়ূব খানের পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ সময় শেখ সাহেব যদি প্যারোলে মুক্ত হয়ে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন তবে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে। একমাত্র আপনিই পারেন তাকে প্যারোলে লাহোর যাওয়া থেকে বিরত রাখতে। তাকে বোঝাতে হবে যে. চাপাচাপি করলে আইয়ূব খান তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন। আর এ কথা আপনাকে গিয়েই বলতে হবে। বেগম মুজিবুর রহমান রাজি হতেই গোয়েন্দা কর্মকর্তা এ. বি. এস. সবদার গিয়ে দেখা করেন জেনালের অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল মুজাফফর উদ্দীনের সাথে। তাদের দুজনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। হঠাৎ একটি পারিবারিক কঠিন সংকট হওয়ায় তার সাথে বেগম মুজিবুর রহমানের দেখা কর একান্ত প্রয়োজন এবং বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। এ কারণ দেখিয়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী সকল দৃষ্টি এড়িয়ে সরাসরি কুর্মিটোলা বন্দি শিবিরে গিয়ে হাজির হল। শেখ মুজিবুর রহমান স্ত্রীকে দেখে অবাক হয়ে যান। কারণ তিনি জানতেন না তার স্ত্রী আসবে দেখা

www.pathagar.com

করতে। বেগম মুজিবর রহমান তার কাছে গিয়ে বললেন, এসব কি শুনছি? তুমি তোমার সহ বন্দিদের রেখে নাকি একা প্যারোলে মুক্ত হচ্ছো। তুমি আমার স্বামী, তুমি মুক্ত হলে আমার চেয়ে বেশি খুশি দুনিয়াতে কে হবে? কিন্তু এভাবে যদি মুক্ত হও তাহলে আর কিছু যদি না পারি বাড়ি গিয়ে বটি দিয়ে ছেলেমেয়ে সবগুলোকে কেটে নিজে আত্মহত্যাতো করতে পারবো। সেদিনই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সিদ্ধান্ত নিলেন প্যারোলে মুক্ত হবেন না। এর পরই শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন নিঃশর্ত মুক্তি ছাড়া তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন না। তাকে তখন নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয় এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাও বাতিল করা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল যেলোক তাকে রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করলেন তার পরিচয় দিতে তিনি কখনো রাজি ছিলেন না।

অন্যের অবদানকে স্বীকার না করার মানসিকতা ছয় দফা প্রণয়ন নিয়েও পাওয়া যায়। ছয় দফা প্রণেতা সম্পর্কিত প্রশ্ন শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত চেপে যান। দীর্ঘ সাত বছর পর তিনি মুখ খুলেলন। ছয় দফা প্রণেতা রুহুল কুদ্দুস বলেন, অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দেবার উদারতার অভাব ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের মানসিকতায়। তার অবর্তমানে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই আমাকে তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেন নি কী কষ্ট আমরা করেছি। কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, তাকেও শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করেন নি। অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান সব সময় এড়িয়ে যেতেন।

পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেশে এসেই সোজা চলে যান সেনানিবাসে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের অবস্থা তদারক করতে।

ছয় দফাতে প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের কথা ছিল। সেটা ছিল পাকিস্তানী কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নতুন কোন প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা আর থাকে না। কারণ প্যারামিলিশিয়া বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল বিদ্যমান এবং সেটা বাংলাদেশ রাইফেলস। সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তর আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ঐ বাহিনী কার্যকরভাবে ব্যবহার করার সুযোগ ছিল। আর এ বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। সেনাবাহিনীর গুরুত্ব না দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তার

www.pathagar.com

একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হল। গঠন করা হল রক্ষী বাহিনী। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চে জাতীয় রক্ষী বাহিনী আদেশে স্বাক্ষর করেন তিনি। ১ ফেব্রুয়ারী থেকে এ আদেশ কার্যকর হবে। অন্য দিকে ভারতীয় গোয়েন্দা সস্থা 'র' রক্ষী বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেমে পড়ে। এ ব্যাপারে সিআইএ তৎপর হয়ে ওঠে।

২৫ মার্চের পর ভারতের মাটিতে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশ প্রেমিক মুক্তি যোদ্ধাদের ভিতর সি. আই, এ যেমন সক্রিয় ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর একইভাবে তৎপর হয়ে ওঠে বাংলাদেশে 'র' এর পরিকল্পনা ধ্বংস করে দিতে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিআইএ একদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের অভ্যন্তরে গা ঢাকা দিয়ে থাকে একটি জোট। আর ঐ জোট হল খন্দকার মোস্তাকের জোট। যাদের সিআইএ তৈরি করে ভারতের মাটিতে, অস্থায়ী বাংলাদেশে সরকারের ভেতরে। আর অন্য দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সততাকে পুঁজি করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে মাঠ নামে। বাংলাদেশের বুকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ওয়াশিংটন থেকে উড়ে আসেন সাংবাদিকের ছদ্মবেশে পিটার কাসটারস। সিআই এ মোস্তাক জোটকে তৈরির মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর পরিকল্পনা নির্মূলের লক্ষ্যই শুধু স্থির করে না শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎখাতের পরিকল্পনাও গ্রহণ করে। শেখ মুজিবুর রহমান আগা গোরাই পশ্চিমা ঘেষা, তবে তাকে কেন সিআইএ উৎখাত করবে?

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দ্বৈত মানসিকতা সম্পন্ন একজন উচ্চাভিলাসী লোক। তার এ মানসিকতার প্রতিফলন শুধু তার ব্যক্তিগত চরিত্রে ফুঠে উঠে নি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার ছাপ পরিষ্কার। আর এ কারণেই মার্কিনীদের আস্থা তাকে হারাতে হয়। আস্থা হারান ভারত এবং রাশিয়ার। তার দ্বৈত রাজনৈতিক মানসিকতার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত হবার পর।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হবার পর ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডনগামী বিমানে আরোহন করার আগে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর দুবার বৈঠক হয়। বৈঠকে শেখ

www.pathagar.com

মুজিবুর রহমান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে আশ্বাস দেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের কাঠামোগত সম্পর্ক বজায় রাখবেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে ইতালির মহিলা সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসিকে দেওয়া সাক্ষাতকারে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, লন্ডন হয়ে ঢাকা ফেরার আগে আমি দুবার তার সাথে দেখা করি। তিনি কোরআন বের করেন এবং স্পর্শ করে বলেন যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলবেন। লন্ডনে পৌঁছে হোটেলে বসে সাংবাদিক এ্যান্থনী মাসকারেনহাসের সাথে আলাপকালে শেখ মুজিবুর রহমান যা বলেন, তাতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে দেওয়া প্রতিশ্রুতির মিল আছে। শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিক এ্যাথনি মাসকারেনহাসকে বলেন, আপনার জন্য একটা দারুণ খবর আছে। এখনো কেউ জানেনা খবরটি। আমরা পাকিস্তানের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্ক রাখতে যাচ্ছি। যতক্ষণ না আমি এ বিষয়ে অন্যের সাথে কথা বলছি তার আগে এসবকিছু প্রকাশ করতে পারবে না। দোহাই আল্লাহর আমি বলার আগে কিছু লিখবে না। সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী একবার এ বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে তিনি এসব অস্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন, ভুট্টোকে তিনি এ ধরনের কোন কথা বলেন নি। হুমায়ুন রশীদের সাথে মক্কায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে দেখা হলে এ বিষয়ে জানতে চান, এবং বলেন শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে বলেছেন তেমন কোন ওয়াদা তিনি আপনার সাথে করেন নি। জুলফিকার আলী ভুট্টো এ কথার প্রতি জোর দিয়ে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান তার কাছে ওয়াদা করেছিলেন।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই বিমানে আরোহন করার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টোকে বলেন, পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের কাঠমোগত সম্পর্ক ঠিক রাখবেন এবং লন্ডনের হোটেলে সাংবাদিক এ্যাথনি মারকারেনহাসকে সে বিষয়ে আভাসও দেন কিন্তু লন্ডনের ঐ হোটেলেই তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রিকে নেহেরুর সাথে আলাপের পর পরই তিনি বদলে যান এবং ঢাকা তেজগাঁ বিমান বন্দরে অবতরণ করার পর ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের সাথে কোন সম্পর্কই রাখবেন না। অথচ তিনি দিল্লী থেকে ভারতীয় বিমানে ঢাকায় আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। ঐ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়

www.pathagar.com

যে, যেহেতু বৃটেন এখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি। সে কারণে দিল্লী থেকে বৃটিশ বিমানে করে তার ঢাকায় যাওয়া ঠিক হবে না। সে কারণেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমান প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাকে ঢাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তার এ আচরণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্দী রাগান্বিত হন। শেখ মুজিবুর রহমান বৃটিশ বিমান যোগেই ঢাকা পৌঁছেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের এ দ্বৈত মানসিকতা আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে ক্ষমতায় আরোহনের পর অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার কৃত গোপন সাত দফা চুক্তি তিনি অগ্রাহ্য করলেও মাত্র দু মাসের মধ্যে প্যারামিলিশিয়া বাহিনীর ধারাটি কার্যকর করেন। প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের প্রস্তাবের মধ্যে 'র' এর পরিকল্পনা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান ভালভাবে অবগত ছিলেন। আর এ বাহিনীর সংগঠক মেজর জেনারেল এস এস উবান সম্পর্কে ধারণাও তার ছিল। তার গোয়েন্দা দফতর তাকে সকল তথ্য সরবরাহ করত। তবু ভারত সরকারকে খুশি করার জন্যে এবং প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার জন্য রক্ষী বাহিনী গঠনের প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করেন। আর মুজিব বাহিনীর দু নেতা সিরাজুল আলম খান ও আব্দুর রাজ্জাককে শেখ মুজিবুর রহমান অস্ত্র জমা দেওয়ার ব্যাপারে যা বলেছিলেন, তাতে তার দ্বৈত মানসিকতা পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং তার আধিপত্যকামী মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। ১৯৭২ সালে তিনি একদিকে সমস্ত মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দিতে বলেন, অপরদিকে আব্দুর রাজ্জাক ও সিরাজুল খানকে অস্ত্র জমা দিতে নিষেধ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের অস্ত্র জমা নিষেধের প্রেক্ষিতে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সিরাজুল আলম খান আর আমাকে ডেকে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, সব অস্ত্র জমা দিওনা। যেগুলো রাখার প্রয়োজন সেগুলো রেখে দাও। কারণ সমাজ বিপ্লব করতে হবে। প্রতি বিপ্লবীদের উৎখাত করতে হবে। সমাজতন্ত্রের দিকে এগুতে হবে। এটা আমাদের দুজনকে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই শুধু নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বেতমানসিকতা প্রতিভাত হতে থাকে। যা পরবর্তীতে তাকে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাছে বিরাগভাজন করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবদান অস্বীকার করা যাবে না, সে কারণেই ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে এলে শেখ মুজিবুর রহমান যে পঁচিশ বছর মেয়াদী

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সহযোগীতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন যা ১৯৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত ভারত -সোভিয়েত চুক্তির অনুরূপ। এ চুক্তি যেমন ভারত কে খুশি করে আবার রাশিয়াকেও খুশি করে। এ চুক্তিতে পশ্চিমা জগত খুশি হতে পারে নি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রকে খুশি করার জন্যে ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। এতে ভারত আবার বিরাগভাজন হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য তাজউদ্দীন এ সম্মেলনে যোগদানের ঘোর বিরোধিতা করেন। এ কারণেই তাজউদ্দীনকে অসম্মান জনকভাবে মন্ত্রীপরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের এ স্বৈররোধী চরিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার সম্পর্কে কতটা আস্থাহীন করে তোলে তা র এর পর্বপেক্ষণ থেকে জানা যায়। র এর পর্যবেক্ষণ কি ছিল? শেখ মুজিবুর রহমান দুই পরাশক্তির আস্থা হারিয়েছেন এবং ভারতেরও। তারা তাদের নিজস্ব লোক না পাওয়া পর্যন্ত তাকে ক্ষমতায় রেখেছে। শেখ মুজিবুর রহমান 'র' এর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তার গোয়েন্দা বিভাগ তাকে জানিয়ে দেয়। তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যখন তাকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে বলে হুশিয়ার করে দেন তা তিনি আমলই দেন নি। ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়া তার হুশিয়ারী সম্পর্কে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধাপিকা মিসেস মেরী সি কাররাসকে স্বাক্ষাতকার দেওয়ার সময় বলেন, আমি শুধু বলতে পারি অনুগ্রহ করে সতর্ক হোন। আমার মনে হচ্ছে মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, না না, তারা আমার সন্তান। শেষ পর্যন্ত সম্ভবত শেখ মুজিবুর রহমান ইন্দিয়া গান্দীকেও বিশ্বাস করতে পারেন নি।

শেখ মুজিবুর রহমানের এ স্ববিরোধী রাজনৈতকি চরিত্রের কারণেই সিআইএ এ তার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যায়। তারা মন্ত্রীসভার মোস্তাক জোটকে হাত করে ফেলে। মিআইএর সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতায় থেকে মিআইএ মোস্তাক জোটকে তাৎক্ষণিক ভাবে আঘাত হানার জন্যে বলে।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের মোড় পরিবর্তন

যুদ্ধের তৎপরতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাংগঠনিক পরিকল্পনা বিবর্তনে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। গেরিলা রণকৌশল প্রয়োগের কারণে পাকিস্তান বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গেরিলা যোদ্ধাদের শত্রুকে অতর্কিত আঘাত করে নিরাপদ এলাকায় সরে যাবার রণকৌশল প্রয়োগে শত্রুরা দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু যেকোন যুদ্ধে গেরিলা আক্রমণই শেষ কথা নয়। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় শত্রুকে বিপর্যস্ত করে তোলা যদিও সম্ভবপর তবু এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কেননা এর মাধ্যমে অর্জিত সফলতা ধরে রাখা, স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব নয়।

গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। এটি প্রচলিত যুদ্ধের বিকল্প নয়। কাজেই একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ, এ জাতীয় সেনাবাহিনী হচ্ছে একটি জাতির সার্বভৌম শক্তির প্রতীক।

যখন নিয়মিত ব্রিগেড পর্যায়ের গঠন প্রক্রিয়ার কথা চিন্তাভাবনা চলছে তখন জুলাই মাসের প্রথম দিকে নির্দেশ এলো ফোর্স গঠন করার জন্য।

জিয়াউর রহমানের অধিনে 'জেড ফোর্স' গঠিত হয়। প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে এই ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ৩ নম্বর সেক্টর থেকে মেজর মঈন, ২ নম্বর সেক্টর থেকে মেজর শাফায়াত জামিল এবং ১ নম্বর সেক্টর থেকে মেজর আমিনুল হক-কে যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়। তেলদহ এলাকায়, জুলাই মাসের প্রথম ভাগে, প্রশিক্ষণের জন্যে ব্যাটালিয়নসমূহকে জমায়েত করা হয়। এক মাস ব্যাপী কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে নবগঠিত এ ব্রিগেডকে উত্তরাঞ্চলে স্বাধীনভাবে অপারেশন চালানোর ক্ষমতা দেয়া হয়। মাইনকার চর থেকে দু'মাইল দূরে, তেলদহে, জেড ফোর্স সদর দফতর স্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধ পরিকল্পনায় নতুন মোড়

অক্টোবর মাসের দিকে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, দেশের এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেয়া যাবে না। এ ভাবধারায় আচ্ছন্ন জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার এ বার্তা প্রত্যেকটি সৈন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রেসিডেন্টের এ আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্যে তিনি তার সেনাপতিদের জানিয়ে দেন যে, কৌশলগত অপসারণও লজ্জাকর, অপ্রত্যাশিত এবং সৈনিকের মর্যাদাবিরোধী কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। যুদ্ধাভিযানে নিয়োজিত সেনাপতিরা তাদের যার যার এলাকার সৈন্যদের সীমান্ত এলাকা ছড়িয়ে দেয় এবং প্রতি ইঞ্চি জমি অধিকারে রাখার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এভাবে পাকিস্তান বাহিনীর বিরাট অংশ সীমান্তে গিয়ে অবস্থান নেয়। এ সামরিক কৌশলটি ইতঃপূর্বে বিয়োঘিত লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতবাদবিরোধী, অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন "শক্তিশালী পয়েন্টসমূহ" রক্ষা করে যেতে হবে।

উপরিরোক্ত মতবাদ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সকল পাকিস্তানী ইউনিট এবং সামরিক বিন্যাসসহ ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস, বেঙ্গারস্, পুলিশ বাহিনীকেও বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। অক্টোবর মাসে নিয়াজী অর্থাৎ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার দিকে মোড় নেন। ১৬তম ডিভিশন নাটোর সদর দফতরসমূহ উত্তর বঙ্গে অবস্থান অব্যাহত রাখে। সমর পরিচালনা সদর দফতর থাকে রংপুরে। কমান্ডে থাকেন মেজর জেনালের নজর হোসেন শাহ।

৯ম ডিভিশন মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারীর নেতৃত্বে যশোর গমন করে। ৩৬তম ডিভিশন ঢাকা এবং ময়মনসিংহ এলাকায়। এর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং হচ্ছেন মেজর জেনারেল জামশেদ যান। ৩৯তম ডিভিশন কুমিল্লা এবং এর দক্ষিণাঞ্চলের দায়িত্বে। কমান্ডে রয়েছেন মেজর জেনারেল এম. রহিম খান। ১৪তম ডিভিশন ভৈরব এবং সিলেট এলাকার জন্যে - কমান্ডে নিয়োজিত মেজর জেনারেল এ. মজিদ।

আরেক দৃশ্যপট। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সদর দফতর। এখান থেকে নির্দেশ জারি হয় আরো দু'টি ব্রিগেড দু'টি গঠন করার জন্যে ব্রিগেট দুটি গড়ে ওঠে। যুদ্ধাভিযানে নিয়োজিত হওয়ার আগে কঠোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সীমিত অপারেশনের জন্যে ব্রিগেড দু'টি প্রস্তুত থাকে।

www.pathagar.com

যুদ্ধাভিযানে জেড ফোর্স

এতদিন কোম্পানী এবং প্ল্যাটুনের পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শত্রুদেরকে অতর্কিত হামলায় সন্ত্রস্ত করে রাখা হতো। কখনো কোনো বড়ো ধরনের সংঘর্ষে ব্রিগেড তো নয়ই, একটি ব্যাটালিয়নও মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত নিয়োজিত করা সম্ভব হয় নি। মাটির প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অপারেশনের ধরন-ধারণ নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে বড়ো ধরনের রণকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এখানে যুদ্ধের ঘটনাস্থলকে বিচ্ছিন্ন কক্ষে বিভক্ত করতে হয় এবং এর ফলে-পরস্পর থেকে দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রত্যেকটি কক্ষকে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি বিশেষ স্থানে এবং সময়ে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলসমূহে সৈন্য সমাবেশ করা চিন্তা ভাবনার বিষয়। এ দিকটি বিবেচনায় পাকিস্তান বাহিনী সীমিত সংখ্যক ফাঁড়িসমূহে শক্তিশালী ঘাটি গড়ে তুলতে পারতো। কিন্তু পাকিস্তানী কমান্ডারগণ ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী তার কমান্ডারদের নির্দেশ দিলেন অসংখ্য ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করে প্রত্যেক ইঞ্চি জমি যেনো ধরে রাখা হয়। এতদিন পর্যন্ত আমাদের অনিয়মিত যুদ্ধ পরিচালনা ভালোই ছিলো কিন্তু লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীর সাম্প্রতিক রণকৌশল মোকাবিলার জন্যে বাংলাদেশী সৈন্যদের অপারেশনের আকৃতি-প্রকৃতি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। একটি ব্যাটালিয়ন বা ব্রিগেড পর্যায়ে আক্রমণে দু'টি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে: এক. উদ্যম বজায় থাকবে; দুই. সৈন্যদের মনোবল উঁচিয়ে উঠবে। জেড ফোর্স' সাংঠনিকও প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর, এখন যুদ্ধাভিযানের জন্যে প্রস্তুত।

কমলপুর

পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের মুখে এবং ময়মনসিংহ-জামালপুর রাস্তায় অবস্থিত কমলপুর হচ্ছে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর একটি সুদৃঢ় ঘাটি। এর মধ্যে কংক্রিট নির্মিত বাংকারসহ শেল গ্রুপ ছাদ রয়েছে। ঘাটিসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে পরিখা খনন করেছে। প্রতিরক্ষা পরিসীমার মধ্যে রয়েছে ফাঁদ বা 'বুবিট্রাপস' এবং 'মাইন ফিল্ড'। রাতের বেলা পাকিস্তানী সৈন্যরা অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা লাইনের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করে।

কোয়েটায় ছিলো ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সিংহ হৃদয়সম্পন্ন এ যুবকটি রক্তাক্ত বাংলাদেশের একজন নীরব দর্শক হতে

www.pathagar.com

রাজি নয়। বেপরোয়া চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ জুলাই-এর প্রথম দিকে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে এসে যোগদান করে জেড-ফোর্সে। সে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল অফিসার ছিল।

তখন ব্যাটালিয়নটি একটি বড়ো রকমের আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। এ কারণে শত্রু পক্ষের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সে দায়িত্ব পালন করে। কমলপুরে কখনো কখনো দুর্দান্ত সাহসিক পর্যবেক্ষণ মিশনে অংশগ্রহণ করে।

এক অভিযানে সালাহউদ্দীন মমতাজ পাকিস্তানী টহলদার সৈনিকদের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। শত্রুরা তখন বাংলাদেশীদের প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা করতে সক্ষম হয়। এর ফলে কমলপুরে শত্রু বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। সেখানে ৩১ তম বেলুচের দু'টি কোম্পানীর আনা হয়।

তথ্য সংগ্রহের পরে আক্রমণ পরিকল্পনা করা হয়। পাকিস্তান বাহিনীর ঘাটির উত্তর পূর্ব দিক থেকে দু' কোম্পানী সৈন্যসহ আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সে অনুযায়ী বাম দিকে থাকবে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজের নেতৃত্বে ডেল্টা কোম্পানী এবং ডান দিকে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে ব্র্যাভো কোম্পানী ব্যূহের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাটালিয়ন অর্ডারস গ্রুপ যেখানে মেজর মঈন ছাড়াও ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জিয়া, উপস্থিত থাকবেন।

'সময় নির্ধারিত' নির্ধারিত হয় পহেলা আগস্ট, রাত ৩টা ৩০ মিনিটে। আক্রমণ করা হবে। নির্ধারিত সময়ের ২০ মিনিট আগে সাহায্যকারী গোলন্দাজ বাহিনীর জন্যে কর্মসূচি স্থির করা হয়।

আক্রমণ পুরোভাগে সৈনিকেরা একবারে অনভিজ্ঞ। অবস্থান নিয়ে সামান্য ভুলের কারণে অগ্রসর হতে বিলম্ব হয়। যখন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগুতে থাকে তখনি শত্রুর কামান সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সৈন্যরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হয়। হতাহতের সংখ্যা বেড়ে চলে। তাদের গতি শ্লথ হয়ে আসে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সৈন্যদের যুদ্ধ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা নেই। যতো না হচ্ছে মন্থর গোলাবর্ষণ তার চেয়ে বেশি ওরা মাটির উপরে শুয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ বীরোচিত ভূমিকা পালন করে। এ পর্যায়ে তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি পায় তারা দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুর দিকে এগিয়ে যায়। এ পর্যায়ে বাইরে পরিসীমা পাকিস্তানী সৈন্যরা ছেড়ে দেয়। বাংলাদেশী সৈন্যরা সেখানে প্রবেশ করে এবং মাইন

www.pathagar.com

ফিল্ড অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা এবং শেল প্রুফ বাংকার থেকে গোলার্বণ শুরু করে।

যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু জেড ফোর্সের সৈন্যরাও সংকল্পবদ্ধ– কিছুতেই পিছু হবে না। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ তার গতিশীল নেতৃত্বে সৈন্যদের ইনার ডিফেন্স বা দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে নিয়ে যায়। উচ্চ কণ্ঠে সে তার বাহিনীকে প্রেরণাদায়ক শব্দাবলির উচ্চারণে প্রাণপণ লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ তার বিশ্বস্ত সৈনিকের একজনকে ধমক দিয়ে বলেছেন-'আমাকে হত্যা করার মতো কোন বুলেট জেনারেল ইয়াহিয়া খান আজো তৈরি করতে পারে নি।'

তার এই কথা শেষ হতে না হতেই সামনে এসে দু'টি গোলা পড়ে। দু'বার তারদেহ কেঁপে ওঠে- তারপর নিস্তব্ধ নিশ্চল হয়ে যায়।

ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ অস্ফুট কণ্ঠে বলে -"যদি মরতে হয় শত্রুকে মেরে তারপর মরো। বাংলাদেশের মাটিতেই মরো।" ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজের মৃতদেহ উদ্ধার করা যায় নি। তার মৃতু দেহ উদ্ধারের চেষ্টায় তিনজন মুক্তিসেনার মৃত্যু যায়। তার হাতঘড়ি, স্টেনগান এবং কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়।

ক্যাপ্টেন হাফিজ অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। শত্রুর নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে তার স্টেনগান উড়ে যায়। সে আহত হয়। এসব ঘটনায় আক্রমণরত দু'টি কোম্পানী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যূহের পেছনে অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার বা সমাজ-কেন্দ্র হতাহত সৈনিকদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন প্রায় ভোর প্রকাশ্য দিবালোক। হতাহতদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাই সকাল সাড়ে সাতটায় মেজর মঈন ব্যাটালিয়ানকে আক্রমণ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়।

উভয়পক্ষের বহু সৈন্য এ যুদ্ধে মারা যায়। প্রথমবারের মত পাকিস্তান সেনাবাহিনী বুঝতে পারে যে বাঙালিরাও মরণপণ যুদ্ধ করতে জানে। সিনিয়র সৈন্যরা কমলপুরের পাকিস্তানী সৈন্যদের মনে ভীতি জাগিয়ে দেয়। কংক্রিট বিবর ঘাটি তাদেরকে বুলেট এবং কামানের গোলা থেকে রক্ষা করেছে বটে কিন্তু ভীতিমুক্ত করতে পারে নি। এ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, বেঙ্গল রেজিমেন্টের নবাগত সৈনিকেরা আক্রমণ পদ্ধতি সম্পর্কে এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ধারাবাহিক সংঘর্ষ চলাকালে কমলপুর স্পিরিট মুক্তিবাহিনী প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়াছে।

www.pathagar.com

বাহাদুরাবাদ ঘাট

'জেড ফোর্স' বাহাদুরাবাদ ঘাটেও অপারেশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয় তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ওপর। জুন মাসে এ ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ড গ্রহণ করেন মেজর শাফায়াত জামিল। পশ্চিম দিনাজপুরে। 'জেড ফোর্স' গঠনের পরে প্রশিক্ষণের জন্যে ব্যাটালিয়ানটিকে তেলদহ আনা হয়।

বাহাদুরাবাদ ঘাট মাল ওঠা-নামার ক্ষেত্রে একটি প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে রেলওয়ে নৌ পরিবহন সার্ভিস রেলগাড়িতে মাল ওঠা-নামা বা স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামরিক সম্ভার এবং সৈন্যদল এ ঘাটের মাধ্যমে উত্তর বঙ্গে প্রেরণ করা হয়।

৩১ জুলাই, ৩ ইস্ট বেঙ্গল যুদ্ধভিযানের জন্যে তেলদহ ছেড়ে যায়! এ ব্যাটালিয়ানে ৩৫০ জন ১৯৭১-পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যিক ছিল বাদবাকি হচ্ছে নব্যগত। অপারেশন এলাকার একজন ছাত্র নাম নাসের পথপ্রদর্শনের কাজ করে।

২০ মাইল দীর্ঘ এবং বিপদসংকুল রাস্তা। রাস্তায় তিনটি নদী পাড়ি দিতে হবে। পুরো এলাকায় শত্রু বাহিনী ঘিরে আছে। নদীতে রয়েছে গানবোট। ১১ টি নৌকায় সৈনিকেরা গন্তব্যে পৌছে। লেফটেন্যান্ট পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদেরকে দেখতে পায় নি তখন রাত ৩টা, ১ আগস্ট। আলফা এবং ডেল্টা কোম্পানী যথাক্রমে লেফটেন্যান্ট আনোয়ার এবং লেফটেন্যান্ট নুরুন্নবীর কমান্ডে বাহাদুরাবাদ আক্রমণের জন্যে সারিবদ্ধ হয়। লেফটেন্যান্ট আনোয়ারের আলফা কোম্পানী রেল লাইনের উত্তর দিকে নৌকা ঘাটে আত্মগোপন করে থাকে। তার একটি প্লাটুন বাহাদুরবাদ ঘাট এবং দেওয়ানগঞ্জের মধ্যবর্তী রেলরাস্তার ওপরে অবস্থান নেয়। নূরুন্নবীর ডেল্টা কোম্পানী আক্রমণ করবে বলে স্থির হয়। তার সামনে দু'টি লক্ষ্য-এক, যাত্রীবাহী ট্রেন বিচ্ছিন্ন করে অপেক্ষমান সামরিক সরঞ্জামবাহী মালগাড়ি আক্রমণ করা; দুই, অন্য প্লাটুনের মাধ্যমে জেটি'র ওপরে হামলা করা।

যাত্রীবাহী ট্রেনটি ভিন্ন পথে নেয়ার কাজ বা শান্টিং চলছে। সুবেদার করম আলী তার ৩.৫ ইঞ্চি রকেট লাঞ্চার থেকে মালগাড়িতে রক্ষিত জেনারেটরে আঘাত হানে। সুবেদার যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন ধ্বংস করে দেয়। একই সময়ে সুবেদার বোলামিয়ার প্লাটুন ডান দিক থেকে যাত্রীবাহী কামরায় যেখানে পাকিস্তানী সৈন্যরা বসে আছে-হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। রেল স্টেশন, রেলবগী, রেল স্টিমার এবং জেটির ছাদ শত্রুদের অস্ত্ররক্ষিত সকল এলাকা ধ্বংস করে বাহাদুরাবাদ ঘাট শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

পরের দিন। আগস্ট মাসের ২ তারিখ বাহাদুরাবাদ ঘাট-এর আক্রমণ দেওয়ানগ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। দেওয়ানগঞ্জ এবং বাহাদুরাবাদ ঘাটের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত রেল সেতু উড়িয়ে দেয়ার জন্যে সুবেদার করম আলী সেদিকে যায়। বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা দ্রুত দেওয়ানগঞ্জে ছুটে যায়।

কিন্তু আলফা এবং ডেল্টা কোম্পানীর ওপরেও এর দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটে। দেওয়ানগঞ্জ বাজার এলাকাসহ সুগার মিল আলফা ও ডেল্টা কোম্পানী সম্মিলিতভাবে হামলা করে। পাকিস্তান বাহিনী নিরস্ত্র হয়। বাহাদুরাবাদ ঘাট এবং দেওয়ানগঞ্জে মুক্তিসেনারা অবস্থান নেয়। এটি জেড ফোর্স -এর একটি বিরাট সাফল্য।

নকশী সীমান্ত ফাঁড়ি

নকশী সীমান্ত ফাঁড়িতে হামলা করার দায়িত্ব পড়ে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিনুল হকের ওপরে। এটা হচ্ছে জেড ফোর্সের ধারাবাহিক আক্রমণের অন্যতম।

রাংতিয়া-নকশী-হালজাতি এলাকায় হামলা চালানোর তিন দিন আগে থেকে পর্যবেক্ষণকারী টহলদার দল সমগ্র এলাকার ওপরে কড়া নজর রাখে। ২ আগস্ট, হামলা শুরু করার কথা ছিল। পরবর্তী সময়ে তা ৩ তারিখে রাত ৩টা ৪৫ মিনিটে নির্ধারিত হয়। সরেজমিনে পুরোপুরি জরীপ চালিয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্তের হালজাতি হাটে সমবেত সৈন্যদের পরিদর্শন করে কোম্পানী কমান্ডার ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী স্থান ত্যাগ করে। একটি নালার পাশ দিয়ে পায়ে, চলার পথে রয়েছে হালজাতি অরণ্যের শালগাছের ঘন বনায়ন। 'জেড ফোর্স' কমান্ডার যুদ্ধ পরিচালনার দৃশ্য দেখার জন্যে হালজাতিতে অবস্থান গ্রহণ করে। রাজেন্দ্রগঞ্জ-রাংতিয়া-হালুয়াঘাট প্রধান সড়কে দু'প্লাটুন মুক্তিসেনা নয়া রাংতিয়ায় বিচ্ছিন্নকরণ দলের ভূমিকায় অবস্থান করে। সমতল ভূমিতে ইপিআর এর এক প্লাটুন সৈন্য মোতায়েন করা হয়। আক্রমণকারী সৈন্যদের সাহায্য করার জন্যে।

আক্রমণকারী মুক্তিসেনারা নিঃশব্দে সমাবেশ স্থানে পৌঁছে। ব্যাটালিয়ান কমান্ডার যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সেখানে রয়েছে ঠিক ৩টা ৪৫ মিনিটে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে সাহায্যকারী গোলন্দাজ বাহিনীর চূড়ান্ত মূহূর্তের আগে বোমাবর্ষণের জন্যে সংকেতবার্তা পাঠানো হয়।

গোলন্দাজ সৈন্যরা এখনো প্রত্যাশিত দক্ষতার মাত্রা অর্জন করতে পারে নি। ফলে কিছু সময় আগেই সমাবেশের স্থানে একটি গোলা এসে পড়ে। গোলার আঘাতে কয়েকজন সৈনিক গুরুতরভাবে আহত হয়। পরিকল্পনা অবিন্যস্ত করার জন্যে তাই যথেষ্ট। বিভ্রান্তি শুরু হয়। ব্যাটালিয়ান এবং

www.pathagar.com

কোম্পানী কমান্ডারগণ এ সংকট থেকে বিচক্ষণতার সাথে আক্রমণকারী দলকে উদ্ধার করেন। কিন্তু এর মধ্যে শত্রু গোলন্দাজ বাংলাদেশী সৈন্যদের অবস্থানে গোলাবর্ষণ শুরু করে দেয়।

উঁচু এলাকায় অবস্থিত ইপিআর বাহিনীর প্লাটুনটি এ অবস্থা আংশিক পরিবর্তনের সক্ষম হয়। আক্রমণকারী সৈন্যরা পুনর্বাসিত হয়ে এগিয়ে যায়। লক্ষ্যস্থলের ৩০০ গজ আগে একটি নালার বাঁধ রয়েছে, কোম্পানী কমান্ডারগণ গুলীবর্ষণসহ আক্রমণ করার জন্যে সৈন্যদের আদেশ দেন। ওরা লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয়।

ঐ মুহূর্তে একটি গোলা এসে ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরীর সামনে পড়ে। সে মারাত্মক আহত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তবু সৈনিকদের গন্তব্যে এগিয়ে যাবার জন্যে চিৎকার করে নির্দেশ দিতে থাকে। এখন সে গোলাবর্ষণের আওতার মধ্যে। কোনো কিছুর আড়ালে যাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। ঢালুর দিকে গড়িয়ে অবস্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে হামাগুড়ি দিতে থাকে শালবনের দিকে।

পাকিস্তানী সৈন্যরা পরিখা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পুরো এলাকা জুড়ে শুরু হয় হাতাহাতি লড়াই। সব রকমের অস্ত্র দিয়ে সংঘর্ষ চলে। কমান্ডো প্লাটুনের আড়ালে অবস্থানরত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর আমিনুল হক আহত এবং বিপদাপন্ন ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরীকে উদ্ধারের জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যান। তিনি হচ্ছেন এমন এক কমান্ডার যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তার সহযোদ্ধাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় রেখে চলে যেতে পারেন না এমনকি তা যদি তার নিজের জীবনের জন্যে বিপজ্জনকও হয় তবু।

মেজর আমিনুল হক মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরীকে তার পিঠে উঠিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। এটি হচ্ছে ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

হারজিত দিয়ে সব সময় যুদ্ধের মান নির্ধারণ করা হয় না । সকল পর্যায়ের কমান্ডারদের উৎসাহ উদ্দীপনা সৈনিকদের গুলীর মুখোমুখি হতে উৎসাহিত করে। ব্যক্তিগত সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠাই হচ্ছে প্রেরণার মূল উৎস এবং এসবের মাধ্যমে যুদ্ধের গুণগত মান চিহ্নিত হয়। এ মানদণ্ডের দিক থেকে নকশী সীমান্ত ফাঁড়ির যুদ্ধ যেকোন বিজয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

'জেড ফোর্স'-এর অপারেশন ১১ নম্বর সেক্টর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সক্রিয় না-হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে 'জেড ফোর্স' মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। চরাঞ্চলসহ রুহুমারি মুক্ত করে । চর কোদালকাঠি এখনো মুক্ত হতে বাকি। জেড ফোর্স-কে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ এলাকার অপারেশন নিয়ন্ত্রণে আসে ১১ নম্বর সেক্টর।

www.pathagar.com

যুদ্ধাভিযানে 'কে' ফোর্স

'কে' ফোর্স-এর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় মেলাঘয়। ৪র্থ, ৯ম, ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মন্দভাগ, লাতুমুড়া এবং বেলোনিয়া এলাকায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য গঠিত হয়। এগুলোর কমান্ডে রয়েছে যথাক্রমে লেফটেন্যান্ট গাফফার, ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম।

লাতুমুড়ার সার্বক্ষণিক প্রতিরক্ষা ঘাটিটি রয়েছে এক প্লাটুন সৈনিক। কসবার উত্তরে, এ ঘাটিটি সামরিক কৌশলের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কসবার প্রতিরক্ষার জন্যে লাতুমুড়া খুবই প্রয়োজন। এর ওপরে শত্রুর শ্যান দৃষ্টি সব সময় বজায় রয়েছে।

এক পর্যায়ে লাতুমুড়া পাকিস্তান সেনা বাহিনীর দখলে আসে। অফিসার ক্যাডেট হুমায়ুন কবির এবং তার কোম্পানীকে ওরা মাঝেমধ্যে হামলা করে। কসবা রেলস্টেশন পাকিস্তানী সৈন্যদের দখলে। মাত্র এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে কসবা পুনর্দখল করা সম্ভব নয়।

বেলোনিয়া পতনের পরে লেফটেন্যান্ট গাফফারকে কসবা সাব-সেক্টরে ফেরত আসার নির্দেশ দেয়া হয়।

ঐ এলাকার পরিস্থিতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। শালদা নদী রেলস্টেশন, বায়েক, মন্দভাগ রেলস্টেশনসহ উত্তরাঞ্চল পাকিস্তানী সৈন্যদের দখলে। মন্দভাগ-কোনাবন এলাকায় মুক্তিবাহিনীর কোন সৈন্য নেই। মেজর সালেক শালদা নদী সাবসেক্টরের কমান্ডে দায়িত্বে রয়েছেন।

লেফটেন্যান্ট গাফফারকে কোনাবনের দায়িত্ব দেয়া হয়। সেখানেই তার সদর দফতর। তার হাতে রয়েছে দু'টি কোম্পানী। এর মধ্যে একটি ক্যাডেট হুমায়ুন কবিরের কমান্ডে। তার অপারেশন এরিয়া কসবা-জদেশ্বর থেকে দক্ষিণে বায়েক পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারত পরিবেষ্টিত এ এলাকাটি পশ্চিমে সি-এন্ড -বি রোড থেকে কোম্পানীগঞ্জ বাজার পর্যন্ত প্রসারিত।

মন্দভাগ পাকিস্তান সৈন্য বাহিনীর শক্ত ঘাটি রয়েছে। ৩০ জুন, লেফটেন্যান্ট গাফফার তাদেরকে হটিয়ে দেয়। ওদের দু'টি পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করে। এর ফলে পার্শ্ববর্তী ৫ টি গ্রাম শত্রুমুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত এ মুক্ত এলাকাটি শরণার্থীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

মন্দভাগ থেকে মুক্তিবাহিনীর হুমকি মোকাবেলা করার জন্যে পাকিস্তান সেনা বাহিনী এগিয়ে আসে। ওরা মন্দভাগ বাজারে ভারী মর্টারসহ আড়াইবাড়ি এবং নয়নপুরে ফিল্ড গান স্থাপন করে। অতঃপর শুরু হয় মন্দভাগের ওপরে দিবারাত্রি গোলাবর্ষণের পালা।

মন্দভাগের দক্ষিণে অবস্থিত বায়েক-এর পতন ঘটে। লেফটেন্যান্ট গাফফার কসবা বায়েক ধরে রাখার কাজে নিয়োজিত হয়। মেজর সালেক কাটামুড়া থেকে গৌরাঙ্গতলা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। তার প্রতিপত্তি নয়ানপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময়ে শত্রুদের যাতায়াত পথ, সড়ক, রেলওয়ে এবং নদীপথে বেশ কয়েকবার অপ্রত্যাশিত হামলা করা হয় এবং বহু অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সরবরাহকৃত মালামাল মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়।

এ পরিস্থিতি চলাকালে 'কে' ফোর্স নিজস্ব আকার ধারণ করে। এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, দুটি নবগঠিত ব্যাটালিয়নসহ ৯ম এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। সেপ্টেম্বর মাসে এসব ব্যাটালিয়ান সম্মিলিত শক্তিতে অপারেশনে নেমে পড়ে। একই সময়ে শালদানদী-মন্দভাগ এলাকা ছোটখাটো অপারেশনে উচ্চ পর্যায়ের সাফল্য অর্জন করে। পাকিস্তান সেনা বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

কুটি কসবা এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের ৩৩তম বেলুচ অবস্থানে ছিল। ক্রমান্বয়ে ওরা এখানে একটি ব্রিগেড স্থাপন করে। এর মধ্যে ৩০তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে নয়ানপুর এলাকায় প্রেরণ করে। শালদানদী রেলস্টেশন চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-ঢাকা এবং সিলেট যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র তা নয়-এটি শালদানদীর উভয় তীরে পাকিস্তানী সৈন্যদের জন্যেও প্রয়োজনীয়।

গুরুত্ব উপলব্ধি করে মেজর খালেদ শালদানদী রেলস্টেশনে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া। শালদানদী রেল স্টেশনের উত্তরে অবস্থিত বায়েক এলাকায় লেফটেন্যান্ট গাফফারের কোম্পানী মন্দভাগ থেকে এগিয়ে নয়ানপুরের কাছাকাছি আসে। মেজর সালেক শালদানদী পেরিয়ে রেল স্টেশনের পশ্চিমে একটি গুদামে অবস্থান নেয়। ক্যাপ্টেন পাশা মন্দভাগে প্রথম বেঙ্গল গোলন্দাজ নিয়ে অপেক্ষমান থাকে। সুবেদার জব্বার একটি মর্টার সেকশন নিয়ে বায়েক এলাকায়। সার্বিক অভিযানের অধিনায়ক হচ্ছেন মেজর খালেদ।

সময়টা হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে। তিন দিনের প্রস্তুতি নিয়ে

www.pathagar.com

ভোরবেলা সকল সৈনিক নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়। অপেক্ষা করে চূড়ান্ত আঘাত শুরুর পূর্বেকার বোমাবর্ষণের জন্যে।

সকাল ৬ টা ৩০ মিনিট। পাশা শালদানদী রেলস্টেশনসহ নয়ানপুরের ওপরে গোলাবর্ষণ শুরু করে। গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায়। পদাতিক বাহিনী যার যার অবস্থানে যায়। এতোটুকু বিলম্ব না করে পাকিস্তানী সৈন্যদের গোলন্দাজ সৈন্যরা বুড়ীচং, কসবা, কুটি এবং চান্দলা থেকে কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করে।

নয়ানপুরে ক্যাপ্টেন আশরাফের হামলা সফল হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা শালদানদীর দিকে দৌড়ে পিচু হটতে থাকে। নয়ানপুর মুক্ত হল।

মেজর সালেক-এর আক্রমণ তেমন সফল হয় নি। শালদানদীর রেলস্টেশন অনেক বেশি সুরক্ষিত। সংঘর্ষ সকাল ৯ টা পর্যন্ত চলে। ৩ ঘন্টা যুদ্ধের পরে তার গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাবার উপক্রম হীন। অতএব মন্দভাগে ফিরে যাওয়া ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা নেই।

এ যুদ্ধ আংশিকভাবে সফল বলা চলে। শালদানদী চরণ স্টেশনে অধিকতর দৃষ্টি দেয়া উচিত ছিল। মেজর সালেক সেখানে একাকী ছিল। নয়ানপুরকে বিচ্ছিন্ন করার কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। এর ফলে নয়ানপুর থেকে বিতাড়িত পাকিস্তানী সৈন্যরা সহজেই শালদানদী স্টেশনে সরে গিয়ে নিজেদের অবস্থান সংহত করার সুযোগ পেয়ে যায়।

বাহিনী হিসাবে এটি হচ্ছে 'কে' ফোর্স-এর প্রথম অভিযান। সম্পূর্ণ বিজয়ে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে অপরেশনসমূহে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

শালদা নদী রণাঙ্গন

শালদা নদী এলাকার সৈন্যদেরকে লেফটেন্যান্ট গাফফারের কমান্ডে রেখে ২ নম্বর সেক্টর সদর দফতরের কাজে মেজর সালেক এবং ক্যাপ্টেন আশরাফকে ডেকে পাঠানো হয়। এ সাব-সেক্টরের সদর দফতর মন্দভাগে থেকে যায়। এখান থেকে শালদানদীর ওপরে পর্যবেক্ষণ চালানো সহজ হয়। পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় শালদানদী স্টেশনে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সুদৃঢ় ঘাটি রয়েছে। সেখানে সরাসরি আক্রমণ কবলে বড়ো রকমের খেসারত দিতে হবে।

www.pathagar.com

একটি কোম্পানী নিকটবর্তী এলাকাসমূহে চারটি হামলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এসব হবে প্লাটুন পর্যায়ের হামলা। যুগপৎভাবে পরিচালিত এর উদ্দেশ্য হল শালদানদীতে অবস্থানকারী সৈন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কেননা এর ফলে ওরা বসে থাকবে না। ওরা সংঘর্ষে জড়িয়ে যাবে। তখন মুক্তি বাহিনী দু'টি কোম্পানী নিয়ে তিনদিক থেকে হামলা করবে।

৭ অক্টোবর রাতের বেলা। পরিকল্পনা মতে ৪টি হামলকারী সৈন্যদল বড়দুশিয়া, চান্দলা, কেয়ামপুর এবং গেতাবিন্দপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। একই সময়ে হামলা চলে। শালদানদী স্টেশন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। পাকিস্তানী সৈন্যরা হামলাকারীদের ওপরে গুলীবর্ষণ শুরু করে। সারা রাত এ অবস্থা চলতে থাকে। লক্ষ্যস্থলের পূর্বে, উত্তরে এবং পশ্চিম দিকে প্রত্যেকে এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে অবস্থান নেয়, যথাক্রমে নায়েব সুবেদার সিরাজ, সুবেদার মঙ্গল মিয়া, সুবেদার বিলায়েত হোসেন।

সুবেদার ওহাব এক কোম্পানী মুক্তিসেনা নিয়ে সুবেদার মঙ্গল মিয়ার পেছনে অবস্থান গ্রহণ করে। অভিযান শেষে হামলাকারী সৈন্যরা পূর্ব-নির্ধারিত অবস্থানে ফিরে আসে। তখন ৮ অক্টোবর, ভোর বেলা। কিছু সময় বিরতির পরে, সকাল ৮ টায়, শালদানদী স্টেশনে মূল আক্রমণ শুরু করা হয়। ত্রিমুখী আক্রমণ। উভয়পক্ষেই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলে। পাকিস্তানীদের চারটি পরিখার দুটি গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা সরে গিয়ে অপর দুটিতে আশ্রয় নেয়। সুবেদার বেলায়েত তৎক্ষণাৎ উদ্যোগ নিয়ে তার সৈন্যদেরসহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতরে অপর পারে উঠে পাকিস্তানী সৈন্যদের পরিত্যক্ত বাংকার দু'টি দখল করে। এ হামলায় বাজার এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী সৈন্যরা রেল স্টেশনে অবস্থানকারীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

লেফটেন্যান্ট গাফফার তার আক্রমণের সৈন্যদের মাত্রা তীব্রতর করে। পাকিস্তানী সৈন্যদের পরিস্থিতি চরমে ওঠে। তাদের গোলাবারুদ কমে যায়। বেলা ১১ টার দিকে পাকিস্তান বাহিনী নয়ানপুর রেলস্টেশনের দিকে যায়। শেষ পর্যন্ত শালদানদী স্টেশন মুক্ত হল।

পাকিস্তান সেনা বাহিনী আবার আক্রমণ চালায়। পুনর্দখল করতে চায় রেলস্টেশন এবং বাজারে অবস্থিত গুদাম এলাকা। এখানে রয়েছে সুবেদার বেলায়েত। পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাবার সময় আড়াল থেকে একজন পাকিস্তানী সৈন্য তাকে গুলীবিদ্ধ করে। অসম সাহসিক বীর মুক্তিসেনা বেলায়েত

www.pathagar.com

এভাবে স্বাধীনতার জন্যে জীবন বিসর্জন দিন। কিন্তু শালদানদী স্টেশন পুনর্দখলে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান সেনা বাহিনী।

এ অভিযান লেফটেন্যান্ট গাফফারের অসাধারণ রণকৌশলের পরিচয় বহন করে। এর স্বীকৃতি হিসাবে পরবর্তীকালে তাকে 'বীর উত্তম' রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে অলংকৃত করা হয়।

কসবা রণাঙ্গন

৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডে রয়েছেন ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন। এটি হচ্ছে 'কে' ফোর্স-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। গঙ্গাসাগর থেকে কসবা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এর অপারেশনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু লাতুমুড়া এবং কসবা পাকিস্তান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে এর কার্যক্রম বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়।

মেজর খালেদ উক্ত এলাকা থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেন। কসবা এবং লাতুমুড়া হারিয়ে যাবার ফলে ২ নম্বর সেক্টরের রণকৌশলে বিরাট বিপত্তি ঘটে। ৯ম ইস্ট বেঙ্গলের মাধ্যমে কসবা পুনরুদ্ধারের জন্যে মেজর খালেদ স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কসবার উত্তর এবং দক্ষিণে উঁচু এলাকায় ৯ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যূহ রচনা করে এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের দিকে এগিয়ে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যরাও অগ্রসরমান সৈন্যদের ওপরে হামলা চালায়। যুদ্ধক্ষেত্রে মেজর খালেদের উপস্থিতি সৈন্যদেরকে দারুণ উৎসাহিত করে তোলে।

হঠাৎ একটি গোলা এসে মেজর খালেদের সামনে পড়ে এবং এর একটি টুকরো তার কপাল ভেদ করে মাথার ভেতরে ঢুকে যায়। এ হচ্ছে এক মারাত্মক আঘাত।মেজর খালেদ-এর নিথর দেহ মাটিতে পড়ে যায়। সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্যে আগরতলা নিয়ে যাওয়া হয়। মেজর খালেদের বেঁচে থাকার কথা নয়। এ ধরনের ভয়াবহ আঘাতের পরে কেউ বেঁচে থাকে না। কিন্তু প্রকৃতির এক অপরূপ খেয়ালে তিনি বেঁচে যান।

মেজর খালেদের প্রেরণা বৃথা যায় নি। আক্রমণকারী মুক্তিসেনার দল কসবা পুনর্দখল করে। পরবর্তী পর্যায়ে, নভেম্বরে, ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট লাতুমুড়া থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের তাড়িয়ে দেয়। এ যুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর তিনজন অফিসারসহ ৪০ জন মুক্তিসেনা নিহত হয়। আহত হয় ৬০ জন।

www.pathagar.com

বেলোনিয়া পুনঃঅধিকার

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বেলোনিয়া পাকিস্তান সৈন্যদের দখলে চলে যায় তখন থেকে তারা সেখানে অবস্থান দৃঢ় করেছে। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম 'কে' ফোর্সের ভাবধারায় ১০ম ইস্ট বেঙ্গল পুনর্গঠনে মনোযোগী হয়। বেলোনিয়া প্রতিরক্ষার সরাসরি দায়িত্বে থাকে ফেনীতে অবস্থিত পাকিস্তানী ব্রিগেড। এ ব্রিগেডের সর্বোত্তম অংশ বেলোনিয়ায় শক্তিশালী ঘাটি নির্মাণ করে। বেলোনিয়া থেকে ফেনী, পরশুরাম, চিতোলিয়া, ফুলগাজী, মুন্সীরহাট এবং বাঙ্গুরা পর্যন্ত রেল এবং সড়ক পথের ধারে ধারে পাকিস্তানী সৈন্যরা অসংখ্য ঘাটি নির্মাণ করে।

'কে' ফোর্স সংগঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই বাহিনী কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ মৃত্যুতুল্য আঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তার বদল আসেন মেজর খালেদেরই অধিনস্ত অফিসার মেজর সালেক। কিন্তু ১০ম ইস্ট বেঙ্গল, বেলোনিয়া সাব-সেক্টরে, তখন থেকে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কিলো ফোর্সের অধীনে রয়েছে। এই ফোর্সের কমান্ডার হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরূপ।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে লেফটেন্যান্ট মোরশেদের কমান্ডে ২য় ইস্ট বেঙ্গল থেকে এক কোম্পানী সৈন্য বেলোনিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ইতঃপূর্বে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে রেজিমেন্টের পুরানো প্রায় ৮০ ভাগ সৈন্য রয়েছে। ঐ সব সৈন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ। শুধু ২০ ভাগ নতুন সৈন্য। তাদের অস্ত্র এবং সরঞ্জাম সন্তোষজনক পরিমাণে রয়েছে। যেকোনো মানদণ্ডের বিবেচনায় বেলোনিয়ার শত্রু অবস্থানে হানা দেয়ার মতো ক্ষমতা ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের আয়ত্বের মধ্যে।

৬ নভেম্বর, ক্যাপ্টেন রফিক এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে বেলোনিয়া মুক্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হচ্ছে বেলোনিয়া রেল স্টেশন থেকে দক্ষিণে ফেনী পর্যন্ত। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে অপারেশন পরিচালনার জন্যে ক্যাপ্টেন রফিক এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা এ উদ্দেশ্যে বেলোনিয়ার উত্তরে, পরশুরামের দক্ষিণে অবস্থিত সংকীর্ণ পথটি বেছে নেয়। অনুপ্রবেশ শুরু করতে হবে বেলোনিয়ার দু'পার্শ্বদেশ থেকে, সেলোনিয়া এবং মুহুরী নদী একদিকে রেখে, ঠিক অন্যতীর দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে। পরশুরাম বেলোনিয়ার ক্ষুদ্র এলাকা।

www.pathagar.com

বেলোনিয়ার বৃহৎ অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুক্ত করতে হবে। এ অপারেশনে সক্রিয় সহযোগিতা করবে ভারতীয় কিলো ফোর্স। ৮ নভেম্বর হচ্ছে অভিযানের নির্দিষ্ট তারিখ।

এ ছিটমহলের অর্থাৎ বেলোনিয়ার পশ্চিম পাশ থেকে জাফর ইমাম ১০ম ইস্ট বেঙ্গল এবং মোরশেদ ২য় ইস্ট বেঙ্গল-এর এক কোম্পানীসহ বেলোনিয়া এবং মুহুরী নদী অতিক্রম করে পরশুরামের দিকে অগ্রসর হয়। পশ্চিম দিক থেকে ১ নম্বর সেক্টরের একটি সেক্টর ব্যাটালিয়ানস লেফটেন্যান্ট মাহফুজ পরশুরামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণ করে। মুক্তিসেনারা ছোট্ট দলে বিভক্ত হয়ে পূর্ব-নির্ধারিত বিভিন্ন পথে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এসব অপারেশনের ক্ষেত্রে যা হয়, কমাণ্ড এবং নিয়ন্ত্রণ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, বিশেষত পূর্বাহ্নে চিহ্নিত সম্মিলনস্থলে যখন সৈন্যদের একত্রিত হতে হয়। অন্ধকারে এবং অনিশ্চিত পথে, সৈন্যদের অনুপ্রবেশ সুনিয়ন্ত্রিত রাখা খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভোর বেলার আগেই অনুপ্রবেশ সম্পপন্ন হয়। দু'টি বাহিনীই যার যার গন্তব্যস্থলে সময় তালিকা অনুযায়ী পৌঁছে যায়। সৈন্যদল পরিখা খনন করে নিজেদের গোপন অবস্থানে।

নায়েব সুবেদার ইয়ার মোহাম্মদ পরশুরামের বিপরীতে রেলপথের সন্নিকটে তার প্লাটুন মোতায়েন করে । ভোর হয়ে গেছে। শত্রুপক্ষের একটি ট্রলি মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে আর কিছু না জেনে গড়িয়ে যাচ্ছে। এটি কাছাকাছি চলে আসতেই নায়েব সুবেদার ইয়ার মোহাম্মাদ গুলীবর্ষণে আদেশ দেয় । এখানেই যুদ্ধের সূত্রপাত। ট্রলি লাইনচ্যুত হয় এবং যাত্রীদের সবাই; একজন আফিসারসহ নিহত হয়।

পরশুরাম এবং চিতোলিয়ার পাকিস্তানী সৈন্যরা শব্দ শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজের জন্যে ছুটে আসে।

নায়েব সুবেদার ইয়ার মোহাম্মদ তার পরিখা থেকে বের হয়ে ট্রলীর দিকে যায়। নিহত পাকিস্তানী অফিসারের রিভালবারটি ছিনিয়ে তাকে পরিখার দিকে টেনে নিয়ে চলে। এসময় একজন পাকিস্তানী সৈন্য তাকে লক্ষ্য করে তার কপালে গুলী ছোড়ে। ঘটনাস্থলেই ইয়ার মোহাম্মদের মৃত্য ঘটে ।

পাকিস্তান নেশা বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ওরা তাদের গোলান্দাজ সৈন্যদের নিয়ে আসে। পরশুরামে মারাত্মক পরিস্থিতি চলছে । শত্রুরা সেখান

www.pathagar.com

থেকে রাতের বেলা হামলা চালায়। বেলোনিয়া থেকেও সাহায্য আসে চিতোলিয়ার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। যাহোক; পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করে।

১০ নভেম্বর পর্যন্ত শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ অব্যাহত থাকে। বেলা ৪ টায় বিমান আক্রমণে তা আরো জোরদার হয় । মুক্তিবাহিনী পরিখায় আত্মগোপন করে থাকে। এর ফলে বিমান আক্রমণে কোন ক্ষতি করতে পারে না। পরের দিনও একই আবস্থা ।

আবার বিমান আক্রমণ শুরু হয় । মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর দিয়ে ৪ টি পাকিস্তানী জঙ্গী বিমান উড়ে যায় । রকেট নিক্ষেপ করে মুক্তিবাহিনীর হাতে কোন বিমানবিধ্বংসী কামান নেই। তবু একজন সৈনিকের মেশিনগানের গুলীতে একটি জঙ্গী বিমান ভূপাতিত হয়। এটি হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর একটি স্মরণীয় ঘটনা। একই রাতে কিলো ফোর্স মুক্তি বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে আসে। বেলোনিয়া এবং পরশুরামে যুগপৎ আক্রমণ চলে। শত্রুদের এ দু'টি অবস্থান মুক্তি বাহিনী দখল করে। এ যুদ্ধে ৪৯ জন পাকিস্তানী সৈন্য মুক্তি বাহিনীর হাতে বন্দী হয়।

জীবিত পাকিস্তানী সৈন্যরা চিতোলিয়ার সৈন্যদের সহ মুন্সীরহাটের পথ ধরে আরো দক্ষিণে হটে যায়। মুক্তি বাহিনীর সম্মিলিত সৈন্যরা ওদেরকে ধাওয়া করতে গিয়ে নিলোকি এলাকায় শিবির স্থাপন করে। এর ফলে ফুলগাজীর ওপরে হুমকি আসে। চিতোলিয়াও পাকিস্তানী সৈন্যদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ওরা ফুলগাজী চলে যায় যদিও সেখানকার পরিস্থিতি মোটেই তাদের অনুকূল নয়। তাদের সমাবেশ সেখানেও স্থায়ী নয়, কেননা এটা তাদের জানা হয়ে গেছে যে বেলোনিয়া ছিটমহলের প্রবেশপথ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না।

অতএব সবাই মিলে বান্ধুরা গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু হামলাকারী মুক্তিবাহিনী থেমে নেই। তারা পাকিস্তানীদের ধাওয়া করে বান্ধুরার উল্টোদিকে কালিরহাতা এবং পাঠাননগরে দ্রুত নিজেদেরকে পুনর্বিন্যাস করে। আরো দক্ষিণে সোনাগাজী আগেই গেরিলাদল দখল করে নিয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বাহিনীর সামনে শুধু একটি মাত্র বিকল্প রয়েছে এবং তা হচ্ছে ফেনীর মাধ্যমে লাকসামের দিকে হটে যাওয়া। ফেনী অবশ্য ৬ ডিসেম্বর মুক্ত হয়।

www.pathagar.com

যুদ্ধাভিযানে 'এস' ফোর্স

সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দফতর থেকে এমর্মে নির্দেশ দেয় যে, ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড বা পদাতিক ব্রিগেডের সমতুল্য একটি নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। উক্ত আদেশ বলে কমান্ড পুনর্গঠন করা হয়। ব্রিগেড গঠন করার মতো যথেষ্ট সৈন্য রয়েছে। এর ফলে সেক্টরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে না। দশ কোম্পানী সৈন্য গঠিত এ সেক্টরের সবাইকে যার যার অবস্থানে রাখা হল।

পহেলা অক্টোবর ফটিকছড়ায় সদর দফতর সহ 'এস' ফোর্স প্রতিষ্ঠিত হয়। ২য় এবং ১১ তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রথম থেকেই এ বাহিনীর সাথে জড়িত রয়েছে। সেক্টর সদর দফতর হেজামারায় অপরিবর্তিত।

পূর্বে থেকেই একটি শক্তিশালী কমবেট ফোর্স বা লড়াইয়ের জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি বাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা হচ্ছিল। এর অনেক কারণ রয়েছে।

সেসবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে প্রচলিত যুদ্ধের পদ্ধতিতে শত্রুদেরকে রণকৌশলে পরাজিত করা। আর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, পুরাতন সৈন্যদের স্মৃতিবিভ্রম ঘটার আগেই একটি নিয়মিত বাহিনীর ঐতিহ্য জাগিয়ে তোলা। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্যে গেরিলা যুদ্ধ অপরিহার্য। পাকিস্তানী সৈন্যদের পতন অত্যাসন্ন যখন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, নিয়মিত বাহিনী তখন যুদ্ধ এলাকা হস্তগত করার কাজে নিয়োজিত হয়। আসন্ন বিজয় সম্পর্কে আমরা আশাবাদী; এর জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি পর্ব নির্মাণেও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এস ফোর্সের সদর দফতরে ৫ জন অফিসার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ অফিসার মেজর গুলাতি এস ফোর্সের বিগ্রেড মেজর। এবং মেজর আজিজুর রহমান হচ্ছে -জি থ্রি, ভারতীয় বাহিনীর পদাতিক অফিসার মেজর ডি. আর. নিজাওয়ান হচ্ছেন ডি কিউ বা ডেপুটি কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল। ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন, স্টাফ ক্যাপ্টেন। ব্রিগেড সিগনাল অফিসার হিসেবে সদর দফতরে নিয়োজিত রয়েছেন এয়ার ফোর্স নেভিগেটর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রউফ।

www.pathagar.com

২য় ইস্ট বেঙ্গল-এর কমান্ডিং অফিসারের নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন মেজর মঈন। তার এডজুটেন্ট সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সাঈদ। লেফটেন্যান্ট আবুল হোসেন, মেডিকেল অফিসার। কোম্পানী কমান্ডার এবং অফিসারদের বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এ কোম্পানী ঃ ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান। তার কোম্পানী অফিসার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনিসুল হাসান। বি কোম্পানী ঃ লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান। তার কোম্পানী অফিসার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সলিম মাহমুদ কামরুল হাসান। সি কোম্পানী ঃ লেফটেন্যান্ট ইব্রাহীম। ডি কোম্পানীঃ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আবুল।

সেক্টর সৈন্যদের নিয়ে ১০টি কোম্পানী গঠিত। এমনভাবে তাদের সংগঠনের ব্যবস্থা করা হয় যাতে প্রয়োজনে দু'টি ব্যাটালিয়ন তৈরি করা সম্ভব হয়।

নতুন সেক্টর কমান্ডার হচ্ছেন ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান। তার দু'জন অসামরিক স্টাফ অফিসার রয়েছে- একজন নুরুদ্দিন এম, কামাল অপরজন হচ্ছে এম. এ. মহী। আলকাস মিয়া এবং আশেক হোসেন হচ্ছে সহকারী অসামরিক অফিসার।

সেক্টরে ৫ জন কোম্পানী কমান্ডার। প্রত্যেক কমান্ডার দু'টি কোম্পানী পরিচালনা করছে। ক্যাপ্টেন মতিন, ক্যাপ্টেন ইজাজ আহমেদ চৌধুরী, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সাদেক, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মজুমদার এবং লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে কোম্পানী কমান্ডারদের একটি সুন্দর টীম গড়ে তোলেন।

'এস ফোর্স' সেক্টর সৈন্যদের থেকে আলাদা। সে কোনো অপারেশন শুরু করার আগে এস ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত সৈন্যদের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বিন্যাস। দুটি ব্যাটালিয়ানই অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সৈন্য নিয়ে গঠিত।

সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ১২০০ লোক সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তী দু'মাস তাদের চলতি পদ্ধতির রণকৌশলে প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে নিয়োজিত করা হয়।

ধর্মগড় অভিযান

সবেমাত্র এস ফোর্স সংগঠিত। এখনো প্রবেশন এবং প্রশিক্ষণের কাজ চলছে এ সময়ে তাদেরকে দিয়ে ধর্মগড়-ইটাখোলা সড়ক মুক্ত করার কথা চিন্তা করা হয়। ধর্মগড় হচ্ছে পাকিস্তান বাহিনীর একটি সুরক্ষিত ফাঁড়ি। মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব তথ্যসংগ্রহ অনুযায়ী এখানে একটি শক্তিশালী নিয়মিত প্লাটুন রয়েছে।

www.pathagar.com

১১ তম ইস্ট বেঙ্গল এখনো পূর্ণমাত্রায় গড়ে ওঠেনি। সৈন্যদেরকে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যে অস্ত্রসজ্জিত করা হচ্ছে। আক্রমণ পরিচালনায় সমর্থ এবং উপযোগী হচ্ছে একমাত্র ২য় ইস্ট বেঙ্গল। তাদের প্রশিক্ষণ মান এবং কাজের ধরন বোঝার জন্যে একটি মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষত তাদের গেরিলা রণকৌশলের প্রেক্ষাপটে। ধর্মগড়সহ এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় হামলাসহ ক্ষুদ্র ধরনের কয়েকটি আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেছে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভুঁইয়া। কয়েক মাস হল, এই অফিসার এম ফোর্সের সাথে এসে যোগ দিয়েছে। একটি ব্যাটালিয়ন কমান্ড করার মতো যথেষ্ট সিনিয়র তিনি। অতএব, তার কমান্ডের যোগ্যতা দেখার জন্য তাকে হামলাকারী কোম্পানীর কমান্ডার হিসাবে মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দু'টি প্রতিবন্ধকতা তৈরির মাধ্যমে হামলা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একটি পূর্ব দিকে। আরেকটি পশ্চিমে। উত্তরে মীরপুর বাজারে ব্লক যার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবেন ক্যাপ্টেন মতিন এবং ক্যাপ্টেন নাসিম। আহমেদপুরে-পশ্চিম দিকে লেফটেন্যান্ট মোরশেদ। ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী দক্ষিণ দিক থেকে মালঞ্চপুর সীমান্ত অতিক্রম করবে এবং পশ্চিম দিক থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থানের ওপরে হামলা করবে। আক্রমণের দিন হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখ এবং আক্রমণের চূড়ান্ত সময় রাত ৩টা। ভারতীয় মাউন্টেইন ব্যাটারি থেকে গোলন্দাজ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

২৮ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত আক্রমণ-পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ করে সুবেদ আলী তার প্লাটুন কমান্ডারদের নিয়ে। আক্রমণ করার পূর্বে সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়।

নির্ধারিত দিনের পূর্বদিন অর্থাৎ ২ সেপ্টেম্বর সৈন্যরা বাসে রাত ১০ টায় মনতলা থেকে মোহনপুর পৌঁছে। সীমান্তের কাছে মোহনপুর ছিল এসেমব্লি এরিয়া বা সমাবেশস্থল, রাত প্রায় সাড়ে দশটায় এখান থেকে সৈন্যরা মার্চ করে আক্রমণের পূর্বে একত্রিত হওয়ার জায়গার দিকে এগিয়ে যায়। দূরত্ব প্রায় দু'মাইল। তখন ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী আক্রমণকারী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধকালীন পর্যায়ক্রম বলছেন ঃ

"লেফটেন্যান্ট বজিউজ্জামানের ৪ নম্বর প্লাটুন রয়েছে অগ্রবর্তী অবস্থানে। সিনিয়র জেসিও সুবেদার চান মিয়া তার সাথে রয়েছেন। এর পরে থাকছে সুবেদার শফিউল্লাহর ৬ নম্বর প্লাটুন। সাথে রয়েছে হেড কোয়ার্টারস্ কোম্পানী। পেছনে থাকছে সুবেদার তৈয়বের ৫ নম্বর প্লাটুন।"

www.pathagar.com

গভীর কালো রাত। ১০ ফুটের বাইরে কাউকে দেখা যায় না। এসেম্‌ব্লি এরিয়া থেকে যাত্রা শুরু করার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হয়।

নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত সবকিছু মোটামুটি ভালোই চলছিল। কিন্তু তারপরই হচ্ছে বিপত্তির সূত্রপাত। নেভিগেটরকে সামনে নিয়ে অগ্রবর্তী প্লাটুন সময়সূচি অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নাইটনেভিগেশনের ত্রুটির ফলে এটি মূল কলাম বা বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুবেদার শফিউল্লার প্লাটুন তা বুঝতে পেরে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলীকে অবহিত করে।

ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী কলামকে থামিয়ে দিয়ে অগ্রবর্তী প্লাটুনের খোঁজে চারদিকে সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু প্ল্যাটুনটির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। এদিকে সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্লাটুনটি ছাড়াই নির্ধারিত অভিযান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্যদিকে লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান নিজেও বুঝতে পারে যে ওরা ভুল পথে এগিয়ে চলছে। সময়ের এতোটুকু অপচয় না করে সে সমাবেশস্থলে প্রত্যাবর্তন করে। আমি তাকে তৎক্ষণাৎ তার কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে বেতারযন্ত্রের সাহায্যে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলীকে সে কথা জানায়ে দেওয়া হয়।

রাত ৩টা ১৫ মিনিটে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী জানায় যে তার সৈন্যদল এফইউপি-তে পৌঁছে গেছে। ৩টা ২০ মিনিটে সে গোলন্দাজ সদর দফতরে সংকেত প্রেরণ করে। এর অর্থ হল, সে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন গোলন্দাজ বাহিনী ও হাইম প্রোগ্রাম মত গোলা ফায়ার শুরু করে। গোলন্দাজ বাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠার সাথে সাথে পাকিস্তানীরাও পাল্টা গোলাবর্ষণ শুরু করে। একেবারে সমাবেশ স্থলের অবস্থানে। সে কী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। তদুপরি অঝোরে বৃষ্টিপাত।

এফইউপি থেকে লক্ষ্য স্থলের দূরত্ব প্রায় এক হাজার গজ। এ দূরত্ব অতিক্রম করতে ২০ মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়। রাত ৩টা ২০ মিনিটে সৈন্যরা এফইউপি ছেড়ে লক্ষ্যস্থলের দিকে রওয়ানা হয়। যদিও, রাতের অন্ধকার, বৃষ্টি এবং সৈন্যদের ক্লান্তির কারণে সময়ের কিছুটা অপচয় হয়েছে। তবুও ৪টায় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিলো। অথচ ৫টায়ও ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী সেখানে পৌঁছতে পারে নি।

তাই আমার সন্দেহ ওরা সত্যিই ফর্মিং আপ প্লেসে ৩টা ১৫ মিনিটে পৌঁছে ছিলো কিনা। যদিও ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী আমাকে জানিয়েছিলো যে তারা এফইউপিতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমি এখন মনে করি যে তারা

www.pathagar.com

তখনো এফইউপি থেকে অনেক দূরে ছিল এবং সেখানে পৌছার পূর্বেই দিনের আলো সমাগত।

৩টা-২০ মিনিট থেকে গোলন্দাজ বোমাবর্ষণের ফলে শত্রুরা সতর্ক হয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যস্থলে না পৌছার কারণে এবং লক্ষ্যস্থলে সৈন্যরা পৌছার অনেক আগে গোলন্দাজ গোলাবর্ষণ করার ফলে ওরা যথেষ্ট সময় পেয়ে যথাযথ অবস্থানে যেতে সক্ষম হয় এবং তাদের ওপরে যেকোনো আক্রমণ প্রতিহত করার মতো সুযোগ পেয়ে যায়। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গোলন্দাজ ফায়ার সাপোর্ট দেয়া হয় কিন্তু তাদের সে সাপোর্ট অনির্দিষ্টকাল ধরে অব্যাহত থাকার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। অতএব, সৈন্যরা যখন লক্ষ্যস্থলের সন্নিকটে এবং যখন তারা গোলাবর্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রচণ্ডভাবে উপলব্ধি করছিলো তখন তা তাদেরকে যোগান দেয়া সম্ভব হয় নি।

ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী আরো ফায়ার সাপোর্ট-এর জন্যে বার্তা পাঠাতে থাকে কিন্তু তা পায় নি। সন্নিকটে গোলা নিক্ষিপ্ত না হওয়ায় এবং পাকিস্তান বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলী বর্ষণের মুখোমুখি হওয়ার ফলে মুক্তিবাহিনীর অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যস্থলে হামলা চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই, হামলা প্রত্যাহার করা হল।

এ কোম্পানীর অধিকাংশ মুক্তিসেনা সবেমাত্র সংগৃহীত এবং ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী যেভাবে তাদের আক্রমণ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলো এর সাথে একমত হওয়া যায় না যদিও বেশ কিছু প্রতিকূল অবস্থায় আক্রমণ পরিচালনা করতে হয়েছে তবুও ক্যাপ্টেন সুবেদ আলীর কর্মতৎপরতা সন্তোষজনক ছিল না এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যায়।

এ অভিযানের পরপরই পাকিস্তান বাহিনী ঐ ঘাটিতে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে। ঘাটিটি পুনরায় আক্রমণ করার কথা চিন্তা করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ফাঁড়ি থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের হটিয়ে দিতে হলে একটি ব্যাটালিয়ান প্রয়োজন হবে। কিন্তু ভারতীয় ঊর্ধ্বতন কয়েকজন কমান্ডার বিষয়টি ভিন্নতর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেন। তাদের ধারণা, সর্বাধিক দু'টি কোম্পানীর সাহায্যেই এলাকটি শত্রুমুক্ত করা সম্ভবপর। সুতরাং ১৮ তম রাজপুত একই ধরনের পরিকল্পনাসহ দু'কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আক্রমণের দিন হিসেবে ২৮ সেপ্টেম্বরকে ধার্য করা হয়। ২য় ইস্ট বেঙ্গল দু'টি পূর্বনির্ধারিত স্থানে প্রতিবন্ধক স্থাপন করবে। ক্যাপ্টেন সুবেদ আলীকে ন্যস্ত করা হয় ভিন্নতর দায়িত্বে। সে বিজয়নগরের দিক থেকে

www.pathagar.com

লক্ষ্যস্থলের দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর দৃষ্টি ভিন্নমুখি করে তোলার জন্য ভুয়া আক্রমণ পরিচালনা করবে। আক্রমণের সময় ভোর ৫টা। মূল অভিযান উত্তরে মীরপুর বাজার থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ব্যাপক গোলন্দাজ সহযোগিতার ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

সময়সূচি অনুযায়ী সৈন্যরা যার যার অবস্থান নেয়। আক্রমণপূর্ব বোমাবর্ষণ শুরু হয় মাথার ওপর দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থানের ওপরে। একই সময়ে পাকিস্তান বাহিনী পাল্টা বোমাবর্ষণ শুরু করে। পাকিস্তানী অগ্রবর্তী সেনাদলের সামনে স্থাপিত তিনটা ভারী মেশিনগানের গুলীবর্ষণ উপেক্ষা করে ১৮ তম রাজপুত রেজিমেন্টের দুটি কোম্পানী পাকিস্তানীদের অবস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মেশিনগানের সামনে রাজপুত ব্যাটালিয়ানের অবস্থা নড়বড়ে হয়ে ওঠে। সকাল ১০ টা পর্যন্ত প্রচণ্ড হতাহত হওয়া সত্ত্বেও উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। শেষাবধি হামলা অভিযান আরো এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হলে তা প্রত্যাহার করা হয়।

এ অভিযানে ভারতীয়দের ক্ষয়ক্ষতি ছিল বেশ। এ আক্রমণে তাদের একজন অফিসারও মৃত্যুবরণ করে।

মুকুন্দপুর পাকিস্তান সৈন্যমুক্ত

ধর্মগড় অভিযানের পরে প্রশিক্ষণে মনোযোগী হওয়ার জন্যে ব্যাটালিয়ান কমান্ডারদের পরামর্শ দেওয়া হল। এ কথাও বলা হল হামলা চালানোর ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থানসমূহে হামলা চালানো একান্ত জরুরি।

নভেম্বরে প্রথম দিকে ২য় ইস্ট বেঙ্গল-এর প্রশিক্ষণে কিছুটা বিপত্তি দেখা দেয়। ১ নম্বর সেক্টর এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের বেলোনিয়া দখল করার প্রচেষ্টা আরো জোরদার করার জন্যে সেখানে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠাতে হয়েছে। এটি সৈন্যদের বাস্তব প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় বিবেচনায় ইচ্ছা করেই উক্ত কোম্পানীকে বেলোনিয়া অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। বেলোনিয়া অভিযান চলাকালে সৈন্যদের অভিজ্ঞতা অর্জনসহ আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র হামলা পরিচালনা করা যায়।

মুকুন্দপুর গ্রাম এবং রেলস্টেশন এলাকা পাকিস্তান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। একটি পদাতিক প্লাটুন নিয়ে মুকুন্দপু সীমান্ত ফাঁড়িতে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ঘাটিটি মুকুন্দপুর গ্রাম এবং রেলস্টেশনের মাঝামাঝি সীমান্ত এলাকার অদূরে অবস্থিত।

www.pathagar.com

নভেম্বরের প্রথম দিকে উক্ত এলাকায় জোরদার তৎপরতা শুরু করা হয়। এর ফলে পাকিস্তানীরা বিব্রত হয়ে ওঠে। মুক্তিবাহিনী আগেই এলাকাটি মুক্ত করার জন্যে অস্থির, যাতে উত্তরে অবস্থিত ধর্মগড়ে ওরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

মুকুন্দপুর গ্রাম এবং রেলস্টেশন এলাকা পাকিস্তান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। একটি পদাতিক প্লাটুন নিয়ে মুকুন্দপুর সীমান্ত ফাঁড়িতে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ঘাটিটি মুকুন্দপুর গ্রাম এবং রেলস্টেশনের মাঝামাঝি সীমান্ত এলাকার অদূরে অবস্থিত।

১১তম ইস্ট বেঙ্গল এখনো প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যস্ত। এ ধরনের অভিযানের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেই। মোরশেদের কমান্ডে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানী বেলোনিয়া অভিযানে অংশগ্রহণের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। মুকুন্দপুর হামলার জন্যে একটি কোম্পানী ব্যতীত ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রয়েছে। ১৮ তম রাজপুত উক্ত পরিকল্পনায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সুতরাং মুকুন্দপুর দখলের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করার ব্যাপারে একটি সহজ পরিকল্পায় নিঃশব্দে কাজ চলছে। স্থির হয়, ১৮ তম রাজপুত রেজিমেন্ট উত্তরে জলিলপুরে, রেল লাইন ধরে প্রতিবন্ধক তৈরি করবে। এবং দু'টি কোম্পানী বাদে ২য় ইস্ট বেঙ্গল দক্ষিণে কলাচ্ছড়া নদীর এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করবে। লেফটেন্যান্ট সাঈদ এক কোম্পানী সৈন্যসহ মুকুন্দপুরে হামলা চালাবে। ১৮ নভেম্বর রাতে হামলা শুরুর সময় নির্দিষ্ট হলো। পরিকল্পনা মতে পশ্চিম দিক থেকে খুব ভোরে হামলা শুরু হবে।

লক্ষ্যস্থলের উত্তরে ১৮তম রাজপুত এবং দক্ষিণে ২য় ইস্ট বেঙ্গল প্রতিবন্ধকতার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সাঈদ তার কোম্পানীসহ ছোট্ট ছোট্ট দলে বিভক্ত হয়ে মুকুন্দপুরের দক্ষিণে একটি ফলের বাগানে সমবেত হবে। এটি হচ্ছে পাকিস্তানীদের অধিকৃত এলাকা। গ্রামের দক্ষিণ ধারে ব্যূহ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ স্থানটি সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে ৮০০ গজ দূরে। সামগ্রিক তৎপরতা হামলা শুরুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যতোটা সম্ভব গোপনে চলতে থাকে। গোলন্দাজ সেনাদলের সতর্কবস্থায় রাখা হয়, অর্থাৎ হামলাকারী কমান্ডার আক্রমণ ধ্বনি শুরু হলে অথবা যখন তারা চান, তখনি কেবল গোলন্দাজ গোলাবর্ষণের সহযোগিতা দিবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু ভালোভাবে এগোয় এবং ১৯ নভেম্বর প্রভাতকালীন হামলা শুরু হয়। পাকিস্তানীরা তাদের ফাঁড়ি থেকে বেপরোয়া গতিতে মুক্তিবাহনীর হামলা প্রতিরোধ করে। অদূরবর্তী ফাঁড়িসমূহ থেকে

www.pathagar.com

কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য আক্রান্ত ফাঁড়ির সাহায্যে আসার জন্যে চেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রতিবন্ধক অবস্থানে নিয়োজিত সৈন্যরা তাদেরকে প্রতিরোধ করে। অপরাহ্ন পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সাঈদ মুকুন্দপুর দখল করে।

মুক্তিবাহিনীর কেউ অলৌকিকভাবে কোন মারাত্মক আঘাত পায় নি। পাকিস্তানী বাহিনীর ৩১ জন আমাদের হাতে বন্দী হয়। হস্তগত হয় ২৭ টি রাইফেল, ২টি স্টেনগান, ২টি এলএমজি এবং ১×৩ ইঞ্চি মর্টার। মকুন্দপুর বিজয় হচ্ছে এক মস্তবড়ো বিজয়। এবং এর ফলে পরবর্তীকালে অভিযানসমূহের ক্ষেত্রে মুকুন্দপুরকে একটি উন্মুক্ত অবস্থান হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ হয়।

আখাউড়া রণাঙ্গন

এখন হচ্ছে সর্বাত্মক আক্রমণের সময় পরিপক্ক অবস্থায় এবং প্রস্তুতির শেষপ্রান্তে চারদিকে সম্ভাব্য, বিজয়ের হাসি। মুক্তিবাহনীর সৈন্যদের আকাশ-ছোঁয়া মনোবল। কাজেই এতটুকু কালক্ষেপণ না করে আমি আখাউড়া মুক্ত করার জন্যে পরিকল্পনা তৈরি করি। পরিকল্পনার দু'টি স্তর বা পর্যায়ক্রম রয়েছে। প্রথম পর্যায় হচ্ছেঃ মনতলা এবং হরজপুর থেকে পাকিস্তান বাহিনী যাতে সিলেটের দিকে পালিয়ে যেতে কিংবা সিলেট থেকে অতিরিক্ত সৈন্য তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে না পারে এর ব্যবস্থা করা। ১১ তম ইস্ট বেঙ্গলকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে ঃ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট উত্তর থেকে দক্ষিণে সিঙ্গারবিল থেকে আখাউড়া, শত্রুমুক্ত করবে। এ অপারেশনের জন্যে ৩নং সেক্টর বাহিনী থেকে ২ কোম্পানী সৈন্য আখাউড়ার পূর্বদিকে এবং আগরতলা বিমানবন্দরের উত্তর পশ্চিমে মোতায়েন করা হয়। এদের দায়িত্ব হচ্ছে হামলাকারী সৈন্যদের পার্শ্বদেশ রক্ষা করা। এ রক্ষা কার্জের দায়িত্ব দেয়া হয় ক্যাপ্টেন মতিন এবং লেফটেন্যান্ট সাদেককে, আরো দূরে, দক্ষিণে, ভারতীয় এলাকায়, ভারতীয় সৈন্যদেরও মোতায়েন করা হয়।

৩০ নভেম্বরের মধ্যে আনুষাঙ্গিক সমস্ত কার্যকলাপ সম্পন্ন করা হয়। মেজর নাসিম উত্তর অক্ষে কার্যকরি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মুকুন্দপুর, হরজপুর এবং মনতলা এলাকা তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কাজেই সীমান্ত এলাকায় সড়ক এবং রেলপথ পাকিস্তানী সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য বন্ধ হয়ে

www.pathagar.com

যায়। ক্যাপ্টেন মতিন এবং লেফটেন্যান্ট সাদেকের অধিনস্ত দু কোম্পানী আগরতলা বিমান ঘাটির উত্তর-পশ্চিম পাশে পরিখা খনন করে অবস্থান নেয় এবং দ্বিতীয় বেঙ্গল-স্টার্ট লাইনে আক্রমণ শুরুর অপেক্ষায় থাকে।

১ ডিসেম্বর রাত ১ টা আক্রমণ শুরু করার জন্যে নির্দিষ্ট সময়। যথা সময়ে আক্রমণ শুরু হয়। দক্ষিণ দিকে, দৃঢ়তার সাথে শত্রুদের বিরোধিতা উপক্ষো করে-তাদেরকে হতাহত করে-সৈন্যরা অগ্রসর হতে থাকে। ভোরবেলার আগে মেজর মুঈনের ব্যাটালিয়ান আজমপুর রেলস্টেশনের উত্তরাঞ্চল থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিতাড়িত করে। পাকিস্তানীদের এখানে বেশ জোরাল অবস্থান ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা উন্মুক্ত এলাকায়-শত্রুর শেল-প্রুফ বাংকারে- এ পরিস্থিতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ চলে। পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিসেনাদের মোকাবেলা করার জন্যে মরিয়া হয়ে পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয় কিন্তু ক্যাপ্টেন মতিন এবং লেফটেন্যান্ট সাদেকের সৈন্যরা তাদেরকে বাংকার থেকে বেরিয়ে আসায় সুযোগ দেয় নি। এর ফলে তার বাহিনীর ওপরে বৃষ্টির মতো গোলা এবং গুলীবর্ষণ হতে থাকে। অপরাহ্ন ৩ টার দিকে আজমপুরে পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতিরোধ ধ্বসে পড়ে। রেলস্টেশনের দক্ষিণ দিক শত্রুমুক্ত হয়।

পাকিস্তান বাহিনী দক্ষিণ দিকে সরে যায়। তারা রাতের বেলা শেষবারের মতো আবার জোরালো আক্রমণ করে। ১-২ ডিসেম্বরে হারিয়ে যাওয়া এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্যে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এ হচ্ছে পুরোপুরি এক অতর্কিত আক্রমণ। সংকল্পবদ্ধ হামলা। আক্রমণ অতোটা অপ্রত্যাশিত ছিল যে মুক্তি যোদ্ধারা কিছুটা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়।

২ ডিসেম্বর, সকালে আজমপুর রেলস্টেশনের একাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। স্টেশনের দক্ষিণ অংশে পাকিস্তান বাহিনীর সিমেন্ট নির্মিত বিবর ঘাঁটি তখনো অক্ষত রয়েছে। তাদের গোলাবারুদের মজুদও ভালো ছিল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে বিরামহীন গোলাগুলী চালাতে থাকে। মেজর মঈন তাৎক্ষণিকভাবে স্টেশন এলাকা দখল করতে ব্যর্থ হয়। তার কাছে অল্পসংখ্যক সৈন্য। ভারী অস্ত্র ও তেমন নেই। তদুপরি, পুরো এলাকায় প্রচুর মাইন বিছানো রয়েছে। ২-৩ ডিসেম্বর সারা রাত গোলা-গুলী বিনিময় চলে তবু মেজর মঈন তার অবস্থানে অবিচল থাকে। রেল স্টেশন তার হাতে থেকে যায়।

৩ ডিসেম্বর, সকাল বেলা থেকে আমরা আবার আখাউড়ার ওপরে হামলা চালায়। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। ২ ডিসেম্বর সকালে শত্রুর দখলে-যাওয়া আজমপুর

www.pathagar.com

এলাকা পুনরুদ্ধার করা হয়। এ অভিযানে গোলন্দাজ গোলাবর্ষণের সহযোগিতা বা ফায়ার সাপোর্ট আগাগোড়া পেয়েছি এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি হল যে, পাকিস্তানীরা মুক্তি যোদ্ধাদের উপর যেভাবে গোলন্দাজ গোলাবর্ষণ করেছে তার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। সর্বোপরি রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ।

আমাদের অবস্থানে পাকিস্তানীদের অব্যাহত বিমান আক্রমণ এবং প্রায় বিরামহীন গোলন্দাজ এবং স্বয়ংক্রিয় গোলীবর্ষণ মুক্তি যোদ্ধাদের সাহস, উদ্দীপনা এবং উৎসাহকে শিথিল করতে পারে নি। তীব্র গোলাগুলীর মুখে সৈন্যরা হুমকি গতিশীল রেখে উত্তর দিক থেকে পাকিস্তান বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। ঠিক এ সময়ে যখন সৈন্যদল আখাউড়ার আশাপাশে অন্যতম এক ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত তখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ এস ফোর্স এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৭ তম মাউন্টেন ডিভিশন আখাউড়াকে ঘিরে ফেলে। পাকিস্তানের বাহিনী আর কোনো যুদ্ধ না করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা উঠিয়ে নেয়।

৫ ডিসেম্বর, আখাউড়ার পতন হয়। এবং সেখানকার পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সকল সৈন্য সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ডিসেম্বরের ৩ তারিখে এস. ফোর্সের সৈন্যরা একটি প্রচণ্ডতম যুদ্ধে জড়িত পড়েছিল। এদিন আমি আমার কয়েকজন অসম সাহসিক সৈন্য মারা গেছে। ওরা নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করেছে। একটি মাত্র মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে জীবন বিষর্জণ দিয়েছে যা হচ্ছে-বাংলাদেশকে দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। তাদের জন্যে দুঃখ হয়- আবার এ কথা ভেবে গৌরববোধও করছি যে তাদের মতো সাহসী দেশপ্রেমিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ড করার মতো সম্মানের অধিকারী আর্মি ছিল এস. ফোর্সের অধিনায়ক মেজর সফিউল্লাহ।

ডিসেম্বরের ১ থেকে ৪ তারিখ পর্যন্ত যুদ্ধে পাকিস্তান সেনা বাহিনী প্রচন্ড হতাহতের শিকার হয়। মুক্তিবাহিনীর হতাহতও কম হয় নি। বীর মুক্তিসেনাদের মধ্যে যারা আখাউড়া যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন এদের মধ্যে যারা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাদের নাম হচ্ছে-লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান, নায়েব সুবেদার আশরাফ আলী খান, সিপাহী আমির হোসেন, সিপাহী নূরুল আমিন, সিপাহী শাহাবুদ্দিন এবং সিপাহী মোস্তাফিজুর রহমান।

www.pathagar.com

ভ্রান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ

যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনী বিশাল কৃতিত্বের অধিকারী। গেরিলা রণকৌশল প্রয়োগের পর থেকে, আগস্ট মাসের মধ্যে, পল্লী এলাকার সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চক্রের মাধ্যমে গঠিত শান্তি কমিটির স্থলে গ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। অধিকাংশ ঘাটি বিলুপ্ত করে সেখানে গেরিলাদের জন্যে শিবির তৈরি করা হয়।

গেরিলা পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে মুক্তিযুদ্ধে আরো কয়েকটি যোদ্ধার গ্রুপ যোগদান করে। তাদের প্রচেষ্টায় উদ্যম এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে তাদের কিছু পার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনো কখনো সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। একটি যোদ্ধার দল উপকূলবর্তী বলয়ের অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের দাপট চালায়। ক্যাপ্টেন জলিলের নেতৃত্বে শ্রমিক এবং কৃষকদের এক বিরাট নেটওয়ার্ক গেরিলা ধাঁচে যুদ্ধে গড়িয়ে যায়। টাঙ্গাইল হচ্ছে বিশেষভাবে কাদের সিদ্দিকীর নিয়ন্ত্রিত এলাকা। তার হাতে রয়েছে প্রায় ৫০০০ তরুণের সশস্ত্র বাহিনী। ফরিদপুরে হাবিলদার হেমায়েতউদ্দিন ও এ ধরনেরই আরেকটি দল সংগঠিত করেছেন। তাদের তৎপরতায় পল্লী অঞ্চলে পাকিস্তান সেনা বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে, গেরিলাবাহিনী নিজেদেঁরকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সুদৃঢ় শক্তিতে রূপান্তর করার সুযোগ লাভ করে।

সীমান্ত এলাকা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরোধিতায় সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। সীমান্তে স্থাপিত প্রশিক্ষণ শিবির থেকে প্রতি দু'সপ্তাহে ১০০০ থেকে ১৫০০ গেরিলা নিয়মিতভাবে বেরিয়ে আসছে। দেশের অভ্যন্তরে এবং সীমান্ত এলাকায় গ্রেনেড, মাইন এবং বুবি ট্র্যাপ তৈরির কারখানা রাতারাতি ছত্রাকের মতো গড়ে উঠছে। বঙ্গোপসাগরের মোহনাও গেরিলা তৎপরতার আওতায় আসে। আগস্ট মাসে নদীপথে আক্রমণাত্মক টহলসহ 'ফ্রগম্যান অপারেশন' তীব্রতর হয়ে ওঠে। যেকোন মানদণ্ডেই হোক, বাংলাদেশের রণাঙ্গনে গেরিলা সংগঠন হচ্ছে একটি অন্যতম প্রধান শক্তি। এ হচ্ছে এমন এক শক্তি যার মূলে রয়েছে সহজাত অনুভূতির বিকাশ, রয়েছে তুলনাহীন সাফল্যের প্রবাহ।

www.pathagar.com

এখন তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হবে যাতে তারা গেরিলা তৎপরতা তীব্রতর করে মুক্তিযুদ্ধের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। গেরিলাদের সশস্ত্র করে তোলার সাথে সাথে একটি নিয়মিত বাহিনী সংগঠনের কাজও অব্যাহত রয়েছে।

এ উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ আগেই বিন্যস্ত করা হয়েছে। জুলাই মাসে 'জেড ফোর্স' বা জিয়া বাহিনী সেপ্টেম্বরে 'এস ফোর্স' বা সফিউলাহ্ বাহিনী এবং 'কে ফোর্স' বা খালেদ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়।

নভেম্বর হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর' জন্যে এক বিরাট উত্তেজনা এবং শিহরণের মাস। ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ বাহিনীর সম্মিলিত যুদ্ধ প্রস্তুতি এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পাকিস্তানী বাহিনীকে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যে সৃষ্ট হয়েছে এ মিলিত প্রয়াস। বাংলাদেশ বাহিনী আগেই সীমান্তের কাছাকাছি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ছিটমহলসমূহ দখল করে ফেলেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধে নিয়োজিত। কিন্তু সর্বত্র বেসামাল অবস্থায়। সম্মিলিত বাহিনীর আসন্ন যুদ্ধাভিযানের ক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর সেসব বিজয় সাফল্যের সোপান হিসেবে পরিগণিত হবে।

পশ্চিম সেক্টরে বয়ড়া যুদ্ধের পরে মেহেরপুর এবং কালীগঞ্জ মুক্ত হয়। এর ফলে ৮ নম্বর সেক্টরের চুয়াডাঙ্গার কাছে পা ফেলার একটা জায়গা তৈরি হল। ৭ নম্বর সেক্টর হিলির দিকে এক বিশাল চাপের সৃষ্টি করে। ৬ নম্বর সেক্টর ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে ভুরুঙ্গামারির উত্তরাঞ্চল মুক্ত করে এবং লালমনিরহাটে অবস্থিত পাকিস্তানী বিমান ঘাটি অচল করে দেয়া হয়। উত্তরে কামালপুরে তাহেরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী একটি সফল যুদ্ধে জড়িত হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের বেলোনিয়ায় একটি পাকিস্তানী ব্রিগেডকে প্রতিহত করা হয়েছে। পাকিস্তানীদের বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়। অক্টোবর থেকে সিলেটে জেড ফোর্স সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পরপর খেজুরিচ্ছড়া, চম্পারায়, ঢালাই এবং পাত্রখোলা চা বাগানের পথে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল সিলেটে প্রবেশ করে। মেজর জিয়াউর রহমানের দক্ষ নেতৃত্বে এই ব্যাটালিয়নটি ২০ নভেম্বর ৩১ তম পাঞ্জাবের হাত থেকে আটগ্রাম দখল করে। এ ব্যাটালিয়নটি প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করার পরে সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত কানাইরঘাটের পূর্ব দিকে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নেয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল ছাতকের সিমেন্ট ফ্যাক্টরী অবরোধ করে। ব্রিগেডিয়ার রানার নেতৃত্বে একটি পাকিস্তানী ব্রিগেড ছ'দিন ধরে প্রতিরোধ চালিয়ে অক্টোবরের শেষের দিকে পিছু হতে বাধ্য হয়। অবরোধকালে কমান্ডার মেজর শাফায়াত জামিল আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। অতঃপর ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর মোহসিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২ নভেম্বর নতুন কমান্ডের নেতৃত্বে গোয়াইনঘাট মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। ৯ নভেম্বর সিলেটের দিকে এ ব্যাটালিয়ন মার্চ করে এগিয়ে যায়।

ইস্ট বেঙ্গল মেজর আমিনুল হক-এর নেতৃত্বে সাগরনল এবং ফুলতলা চা-বাগানের পথে অগ্রসর হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি দক্ষিণগুল চা-বাগান এবং লাতুর ওপরে হামলা চালায়। ডিসেম্বর ১ তারিখের মধ্যে এ ব্যাটালিয়ন কমলগঞ্জ পর্যন্ত এলাকা মুক্ত করে এবং পাকিস্তানী মৌলভীবাজারে সরে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে জিয়া বাহিনী তিন দিক থেকে অদম্য গতিতে সিলেটের দিকে এগিয় চলেছে। চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে সম্মিলিত বাহিনীর পথ সহজ এবং সুগম হয়ে উঠেছে।

অপারেশন লাইটনিং কেম্পেইন

অতঃপর যা ছিলো অনিবার্য, যা ছিলো অবধারিত এবং যা ছিল প্রত্যাশিত-তাই ঘটে। গত ন'মাস ধরে উপমহাদেশে যে হুমকির সৃষ্টি হয়েছিল তা এখন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছে গেছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা'র লাইটিং কেম্পেটন শুরু হল। সম্মিলিত কমান্ডের দুর্বার গতির রূপরেখা হচ্ছে এ অভিযানের মূল উপাদান। এর মধ্যে রয়েছে-শত্রুর শক্তিশালী অবস্থানসমূহ তা রুখতে হবে, প্রবল ধারাবাহিক অগ্রাভিযান শত্রুর সুদৃঢ় দুর্গ এড়িয়ে উপপথে ধাবিত হতে হবে, ছুটে চলবে বিশেষভাবে রাজধানী ঢাকার দিকে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নগরীর দিকে, যেমন-চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া। সনাতন পদ্ধতির ব্যতিক্রম হচ্ছে এ রণকৌশল।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরার পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তিন দিক থেকে তিনটি প্রবল আক্রমণের এবং মেঘালয়ের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প- গতিরোধের আক্রমণ সূচনা করা। এ সমর অভিযানে বিমান বাহিনীর সরাসরি এবং সার্বক্ষণিক সাহায্যের নিশ্চয়তা দেয়া হয় পূর্বাঞ্চল কমান্ড-কে। একইভাবে ভারতীয় পূর্বাঞ্চল নৌ-কমান্ড চট্টগ্রাম এবং চালনা বন্দর অবরুদ্ধ করে বাংলাদেশ অভিযানে সকল সাহায্যের যোগান দেয়।

www.pathagar.com

রণাঙ্গন ঃ পদ্মার পশ্চিমাঞ্চলে

লেফটেন্যান্ট জেনারেল টি. এন. রায়না তার কলকাতাস্থ ১১ তম কোর নিয়ে পদ্মা নদীর পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-খণ্ড মুক্ত করার জন্যে দু'ডিভিশন সৈন্যের নিম্নোক্ত ব্রিগেড কলামসমূহ নিয়ে অভিযান শুরু করেনঃ

ক. কুষ্টিয়ার জন্যে এক ব্রিগেড,

খ. মাগুরা-ফরিদপুরে এক ব্রিগেড,

গ. খুলনা-বরিশালে এক ব্রিগেড,

ঘ. পাকিস্তান বহিনীর পার্শ্বিক অগ্রসর থামিয়ে দেয়ার জন্যে খুলনা-যশোর ভেড়ামারার রেলপথ বিচ্ছিন্ন করার কাজে অবশিষ্ট ব্রিগেডসমূহ নিয়োজিত থাকবে।

এ সেক্টরে মুক্তিবাহিনী আগেই চুয়াডাঙ্গার একাংশ দখল করেছে, যার ফলে এখানে পাকিস্তানী সৈন্যদের কোন সম্মুখীন না হয়ে দুই ব্রিগেড সৈন্য অগ্রসর হয়। পার্শ্বিক যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ওরা ঝিনাইদহ এবং যশোর আক্রমণের জন্যে ব্যূহ রচনা করে। ঝিনাইদহ এবং যশোর পতনের পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেড সদর দপ্তর আরো পূর্বদিকে মাগুরায় স্থানান্তরিত হয়। অন্য দিকে, বিশৃঙ্খল অবস্থায় পাকিস্তানী সৈন্যরা যশোর থেকে খুলনার দিকে ছুটে যায়। কিন্তু এর মধ্যে, দক্ষিণ দিকের সাথে খুলনার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে, পাকিস্তান সেনা বাহিনী বোতল সদৃশ অবস্থায় আটকা পড়ে। মাগুরাও হুমকির মুখোমুখি। পাকিস্তান বাহিনী সরে গিয়ে মধুমতি নদীর তীরে কামারখালির দিকে হটে যায় এবং ফরিদপুরে পশ্চাদপসরণ করার জন্যে উদ্যোগ নেয়। কুষ্টিয়ায় পাকিস্তানীরা প্রবল শক্তিতে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েও অবস্থান ধরে রাখতে পারে নি। এ পরিস্থিতিতে পদ্মার পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পনের প্রহর গুনতে থাকে।

রণাঙ্গন ঃ যমুনার পশ্চিমাঞ্চলে

শিলিগুড়িতে অবস্থানরত লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম. এল. থাপানের ৩৩তম কোর-এর ওপরে অর্পিত হয়েছে দু'টি কাজের দায়িত্ব। এর মধ্যে প্রাথমিক দায়িত্ব হল হিলি এলাকায় ডিভিসন পর্যায়ে আক্রমণ পরিচালনা করা। অবশ্য মুক্তিবাহিনী ইতঃপূর্বে সেসব এলাকার পরিস্থিতি সহজ করে ফেলেছে। দ্বিতীয় কাজ হল, রংপুর এবং দিনাজপুরে অবস্থিত পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সুরক্ষিত দুর্গসমূহে অবরোধ চালিয়ে তাদের চলৎশক্তিকে প্রতিহত করে দেওয়া।

www.pathagar.com

কাজটি খুবই জটিল এবং বিপজ্জনক। এ কারণে অবরোধকারী সৈন্যদের কলাম এবং আক্রমণকারী ডিভিশনভুক্ত সৈন্যদের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। ভারতীয় বাহিনী পীরগঞ্জ, লালমনিরহাট, দুর্গাপুরসহ শেরপুর পর্যন্ত অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে।

১৩ ডিসেম্বর লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী নূরুজ্জামান তার ৭ নম্বর সেক্টরভুক্ত মুক্তিবাহিনী নিয়ে চাপাইনবাবগঞ্জে ঝটিকা আক্রমণ করেন। শহরের দু'দিক থেকে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর এবং মেজর গিয়াস পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি ব্যাটালিয়নের ওপরে হামলা করে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর আক্রমণের সূচনায় থাকে। শত্রুসৈন্যদের বাংকারে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপে এল এমজি বিকল করার প্রচেষ্টাকালে জাহাঙ্গীর নিহত হয়। তার এই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাহসিক দৃষ্টান্ত মুক্তিসেনাদের প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। চাপাইনবাবগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়। চাপাইনবাবগঞ্জের এ বীরকে সাহসিকতার সর্বোচ্চ স্বীকৃতিসূচক "বীরশ্রেষ্ঠ" পুরুস্কারে ভূষিত করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর মুক্ত হয় চাপাইনবাবগঞ্জ। ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে বিখ্যাত দিনাজপুর ব্যাটালিয়ন ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে দিনাজপুরে প্রবেশ করে। ছাত্র, স্বেচ্ছাসেবক এবং লেফটেন্যান্ট বলে পরিচিত তারেক নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, গাইবান্ধা, পলাশবাড়ি মুক্ত করে চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৬ ডিসেম্বর, বগুড়া প্রবেশ করে। লেফটেন্যান্ট তারেকের অসামান্য দুর্বার অভিযানের এক পর্যায়ে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর ১৬ তম ডিভিসনের কমান্ডার মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ পলাশবাড়ি এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেখান থেকে সে ৮ ডিসেম্বর ছদ্মবেশে যাত্রীবাহী বাসে চড়ে রংপুরে পালিয়ে যায়।

রণাঙ্গন ঃ তুরা থেকে দক্ষিণাঞ্চলে

ডিসেম্বর ৪ তারিখে উত্তরে তাহের -এর ১১ নম্বর সেক্টর বাহিনী কমলপুর মুক্ত করে। পরবর্তী দু'দিনে মুক্ত হয় বক্সীগঞ্জ এবং মিরপুর। দেওয়ানগঞ্জ এবং বাহাদুরাবাদ ঘাট, ৭ ডিসেম্বরে, দখলের পরে মুক্তিসেনাদের একটি কলামকে রেলগাড়িতে জামালপুর পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১১ ডিসেম্বর, জামালপুর শত্রুমুক্ত হয়। অতঃপর কলামটি ঢাকার দিকে যাত্রা শুরু করে।

মেজর জেনারেল জি. এস. গীল-এর ১০১ তম কমিউনিকেশন জোন একটি ব্রিগেড নিয়ে গৌহাটি থেকে ৯ ডিসেম্বর জামালপুর শহরের উপকণ্ঠে পৌছে। পরবর্তী সময়ে জেনারেল গীল যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায়

www.pathagar.com

মেজর জেনারেল জি. এস. নাগরা তার স্থলাভিষিক্ত হন। মেজর জেনারেল নাগরা সেই ব্রিগেড নিয়ে ময়মনসিংহের পথে এগিয়ে চলেন।

১১ নম্বর সেক্টরের একটি কলাম ৯ ডিসেম্বরে ময়মনসিংহ রওয়ানা হয়ে পরের দিন শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৪ ডিসেম্বর, ময়মনসিংহ মুক্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কাদের সিদ্দিকীর শক্ত ঘাটি টাঙ্গাইলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের অবস্থান এখনো অব্যাহত রেখে চলছে।

নদীর উত্তরে, কয়েক মাইল দূরে, টাঙ্গাঈল শহরের আরেক প্রান্তে, একটি ভারতীয় প্যারা-ব্যাটালিয়ন পারাস্যুটের মাধ্যমে অবতরণ করে। অতঃপর কাদের বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রেখে সম্মিলিতভাবে টাঙ্গাইল মুক্ত করা হয়। ভারতীয় প্যারা-ব্যাটালিয়ন টাঙ্গাইল মুক্ত করে প্রবল গতিবেগে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

রণাঙ্গন ঃ পদ্মা এবং মেঘনার পূর্বাঞ্চলে

পূর্ব রণাঙ্গণের সবচে' প্রবল শক্তিসম্পন্ন ওয়ার মেশিন বা ফাইটিং মেশিন বা সমরযন্ত্র পরিচালনা করছে ৪র্থ কোর কমাণ্ডের লেঃ জেনারেল সগত সিং তার তিনটি মাউন্টেইন ডিভিশন নিয়ে। বাংলাদেশে ওয়ার থিয়েটার অংশগ্রহণের আগে তিনি তার কোর-এর তিনটি ডিভিশনকে রীতিমত ঈষৎ পরিবর্তন এবং পুনর্বিন্যাসসহ পুনঃবিভাজন করেন। তার দায়িত্ব হচ্ছে "বাংলাদেশের সুরমা নদীর দক্ষিণ অঞ্চল এবং মেঘনা নদীর পূর্বাঞ্চল মুক্ত করা।" প্রাসঙ্গিক কাজ হচ্ছেঃ এক. সরবরাহ লাইন বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে চট্রগ্রামের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা; দুই. মেঘনা নদী অতিক্রম করে ঢাকার দিকে দুর্বার বেগে অগ্রসর হওয়া।

অপারেশন জ্যাকপট

সামগ্রিক পরিকল্পনা পেয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সগত সিং তার নিজের পরিকল্পনা তৈরি করে এর নামকরণ করেন "অপারেশন জ্যাকপট"। মেঘালয় এবং ফেনী ছিটমহলের মধ্যবর্তী ২৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় ত্রিমুখি ডিভিশন পর্যায়ে দুর্বার হামলা পরিচালনার জন্যে তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

উক্ত পরিকল্পনার সারাংশ হচ্ছে এ রকমঃ

ক. শিলচর-করিমগঞ্জ অক্ষরেখা ধরে এক ডিভিশন সৈন্য সিলেটের দিকে যাবে,

www.pathagar.com

খ. আখাউড়া-আশুগঞ্জ অক্ষরেখা ধরে এক ডিভিশন সৈন্য ঢাকার দিকে যাবে,

গ. দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে এক ডিভিশন সৈন্য ৩টি ব্রিগেড কলামে বিভক্ত হয়ে নিম্নোক্ত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হবেঃ

৩. এক ব্রিগেড ফেনী থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়ে চট্টগ্রাম সরবরাহ ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।

তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল সিলেটের দিকে এগিয়ে চলে। ছাতকের পতন ঘটে ৬ ডিসেম্বর। এর পর মেজর শওকতের ৫ নম্বর সেক্টরের সেনাদলসহ চিলিতাবড়ি আক্রমণ করে ৯ ডিসেম্বরে তা দখল করে। পরের দিন, শালুটিকর বিমান ঘাটির পতন ঘটে এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের অধিকাংশ বন্দী হয়। ১৫ ডিসেম্বর, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দু'টি শক্তিশালী ঘাটি-গোবিন্দগঞ্জ এবং লামাগড়ির পতন ঘটে। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল বিজয় দিবসে তিন দিক থেকে সিলেট প্রবেশ করে।

দক্ষিণ দিকে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল প্রচুর বিপত্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে চলার গতি বজায় রাখে। কমলগঞ্জ অধিকার করে ব্যাটালিয়নটি ফেঞ্চুগঞ্জ মুক্ত করে এবং দক্ষিণ দিক থেকে সিলেট অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি নেয় এবং ১৫ ডিসেম্বরে সিলেট শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

উত্তর-পূর্বে, ১ম ইস্ট বেঙ্গল নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সুরমা নদী পর্যন্ত এলাকা মুক্ত করে। ৮ এবং ৯ ডিসেম্বর, ব্যাটালিয়নটি সিলেটের দিকে এগিয়ে গিয়ে ১৪ ডিসেম্বর শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে।

ভৈরব আশুগঞ্জের যুদ্ধ

দক্ষিণে, ৬ ডিসেম্বর, ফেনী মুক্ত করার পরে, ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকে চট্টগ্রাম মুক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়। লাকসাম-মাইজদী মুক্ত হওয়ায়, কিলো ফোর্স সেক্টর সৈন্যদেরসহ কুমিল্লার দিকে এগিয়ে চলে। ১৩ ডিসেম্বর, কুমিল্লা থেকে ৪ মাইল দূরে থাকাকালে পাকিস্তান বাহিনী তাদের ওপরে সংকল্পবদ্ধ হামলা করে। হামলা প্রতিহত করা হয়। এখান থেকে ১০ ইস্ট বেঙ্গল লেফটেন্যান্ট দিদারের এক কোম্পানী ছাড়া-ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের কমান্ডে হাটহাজারির পথে রওয়ানা হয়। এ পথে আগে থেকেই লেফটেন্যান্ট গাফফার ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিল।

www.pathagar.com

১০ম ইস্ট বেঙ্গল-এর কলাম ১৪ ডিসেম্বরে হাটহাজারি থানায় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এলাকাটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে। এ বাহিনী যখন পরিখা খনন করছে তখন লেফটেন্যান্ট গাফফার তাদেরকে পেছনে রেখে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৪ তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের বি কোম্পানীর দখলে রয়েছে হাটহাজারি অঞ্চল। সৈনিক জীবনের শুরুতে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম উক্ত ফোর্সের সাথে জড়িত ছিল। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম তার পুরানা সহকর্মী মেজর হাদীককে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করে। কিন্তু মেজর হাদী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। কয়েকজনকে মৃত এবং যুদ্ধবন্দী হিসাবে রেখে বি কোম্পানী অন্যত্র সরে যায়।

১৫ ডিসেম্বর, লেফটেন্যান্ট গাফফার ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের সাথে যোগ দিয়ে-উভয়ে মিলে নতুন পাড়া আক্রমণ করে।

কুমিরায়, লেফটেন্যান্ট দিদার জোরদার হামলা চালায়। পরাজিত পাকিস্তানী সৈন্যরা ফৌজদারহাটের দিকে পালিয়ে যায়। মিত্র বাহিনী তাদেরকে ধাওয়া করে।

৩ ডিসেম্বর, 'এস' ফোর্সের সৈন্যরা আখাউড়া সেক্টরের এক বিরাট ভূখণ্ড মুক্ত করে। অপারেশন জ্যাকপট শুরু হওয়ার পূর্বে আখাউড়ায় পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা ক্রমশ চাপের মুখে ভেস্তে যাচ্ছিল। কাজেই, ৫৭তম মাউন্টেন ডিভিশনকে আখাউড়া পৌঁছতে তেমন কোন বেগ পেতে হয় নি। সেখানে, ঐ মুহূর্তে 'এস' ফোর্স পাকিস্তানী সৈন্যদের ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত ছিল। যুদ্ধের অবস্থা যখন চরমে, ভারতীয় ৫৭ তম মাউন্টেন ডিভিশন আখাউড়ায় মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে অবরোধ স্থাপন করে। এভাবে, ফাঁদে পড়ে এক ব্রিগেড শক্তিসম্পন্ন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৫ ডিসেম্বর, সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পিছু-ধাওয়ার এক অনন্য চিত্র

আক্রমণ অভিযানে শত্রুপক্ষকে ধাবিত করা বা পিছু-ধাওয়া করা হচ্ছে ধাবমানকারীর বিশাল মনোবল এবং ব্যাপক সামরিক প্রতিভার পরিচায়ক। আবার, ধাবিত পক্ষের জন্যেও তা হচ্ছে এক মারাত্মক কলংকের ব্যাপার। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানী সৈন্যদের আচরণে তাই দেখা গেছে। পাকিস্তান বাহিনী সম্মিলিত বাহিনীর অধীনে পরিচালিত মুক্তিবাহিনী এবং জনতার ফাঁদে আটকা পড়ে। এ হচ্ছে এক অনিবার্য মরণফাঁদ। আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

www.pathagar.com

আখাউড়া পতনের পরে কিছুসংখ্যক শত্রুসৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পথে তাদের বেশিরভাগ মারা পড়ে কিংবা জনতার হাতে ধরা পড়ে। আবার কেউ ব্রাহ্মণবাড়িয়া হামলা করার পরিকল্পনা প্রস্তুত রয়েছে। মিত্রবাহিনীর ৫৭তম মাউন্টেন ডিভিশন দক্ষিণ দিক থেকে রেল পথ এবং সড়ক পথ ধরে এবং 'এস' ফোর্স উত্তর দিক থেকে সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অবরোধের জন্যে এগিয়ে চলে। এ যেনো এক মহাপ্রবল সাঁড়াশি কাঁচির মুখ ব্যাদান।

পরিকল্পনা অনুযায়ী 'এস' ফোর্সকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়া হয় ৫-৬ ডিসেম্বর রাতে ১১তম ইস্ট বেঙ্গল অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণের দায়িত্বে থাকে। আখাউড়া যুদ্ধ থেকে সদ্য আগত ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর পেছনে যাবে। ৩ নম্বর সেক্টর কমান্ডারকে ৬ ডিসেম্বর রাতের মধ্যে তেলিয়াপাড়া এবং মনতলা দখলেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। সিলেট সড়কে মুক্তিবাহিনীর গোলাবারুদ এবং মালামাল নিয়ে যানবাহনের সহজ চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্যে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী সিলেটে সম্মিলিত বাহিনীর হুমকির মুখে পড়ে। কাজেই এটি অতিশয় প্রত্যাশিত যে ওরা ঢাকার দিকে সরে যাওয়ার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠবে। এ কারণে সিলেট মহাসড়ক বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে ১১তম ইস্ট বেঙ্গলকে নির্দেশ দেয়া হয় তারা যেন সরাইল পর্যন্ত মহাসড়কের ওপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করে রাখে। এ প্রচেষ্টার জন্যে এ ব্যাটালিয়নকে প্রদত্ত নির্দেশ হল ঃ

১. চান্দুরার উত্তরে সিলেট মহাসড়কে অবরোধ বা প্রতিবন্ধক তৈরি করা;

২. চান্দুরা এবং সরাইলের মধ্যবর্তী এলাকা পাকিস্তানী সৈন্যদের থেকে করে চলাচলের উপযোগী করে রাখা।

উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে মেজর নাসিম এক কোম্পানী সৈন্য ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভুঁইয়ার অধীনে প্রতিবন্ধক তৈরি করার জন্যে প্রেরণ করে। কাজটি হচ্ছে চান্দুরার এক মাইল উত্তর-পূর্বে একটি সেতু তথা নালার ওপরে রোড ব্লক বা রাস্তা প্রতিবন্ধক স্থাপন করা হবে। এবং একাজটি সম্পন্ন হলে ব্যাটালিয়নের অবশিষ্ট অংশ সরাইলের পথে হরষপুরের মাধ্যমে চান্দুরার দিকে মার্চ করে অগ্রসর হবে।

www.pathagar.com

অগ্রসরমান কোম্পানী চান্দুরার কাছে পাইকপাড়ায় এসে পৌঁছুলে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভুঁইয়া জানায় যে রোড ব্লক নির্মাণের কাজ সমাপ্ত। এটি অবশ্যই একটি সুখবর। মেজর নাসিম স্বাভাবিকভাবেই ব্যাটালিয়নকে পেছন থেকে পানিকস্তানী সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা না রেখে মহাসড়কে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়।

পাকিস্তান বাহিনী চান্দুরা ছেড়ে শাহবাজপুরে চলে গেছে। মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী কোম্পানী অধিকতর দ্রুতবেগে চলছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা শাহবাজপুর সেতু ধ্বংস করে মুক্তিবাহিনীর এগিয়ে চলার গতিকে বিলম্বিত করার আগেই শাহবাজপুর দখলে নেয়ার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।

ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর ইসলামপুর পৌঁছার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর পেছনে একটি ট্রাকের উদয় হয়। ট্রাকটির রং ১১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ট্রাকের মতো। ট্রাকটি দেখে মেজর নাসিম মন্তব্য করে স্যার, ৩ নম্বর সেক্টরের সৈন্যরা নিশ্চয়ই তেলিয়াপাড়া দখল করেছে। একথা বলা প্রয়োজন, মুক্তিবাহিনীরা তেলিয়াপাড়ার বিপরীত ভারতে রয়েছে। অতএব, তেলিয়াপাড়া দখল না করে মুক্তিবাহিনীর যানবাহন কখনো এ পথে আসার কথা নয়। পাকিস্তানীদের যানবাহন প্রত্যাশিত নয়। কেননা ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভুঁইয়া চান্দুরার উত্তর-পূর্বে রোড ব্লক করে রেখেছে বলে খবর পাঠিয়েছে।

ট্রাকটি কাছাকাছি এলে তা থামানোর জন্যে ড্রাইভারকে সংকেত দেওয়া হয়। ট্রাকটি থেমে যায়। এটি কল্পনারও অতীত, যে এই ট্রাকে পাকিস্তানী সৈন্যরা থাকবে। তারা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মুক্তিবাহিনীর দিকে তাকিয়ে ছিল। ওরা ১৪ কী ১৫ জন। ওরাও কম বিস্মিত এবং হতাশ নয়। পিছনে হটে-যাওয়া শত্রুদের পক্ষে বিপক্ষের দিকে এভাবে তাকানো এক অস্বাভাবিক ব্যাপার।

একটি নাটকীয় উপাখ্যান

পাকিস্তান বাহিনীর ট্রাকটির বিস্ময়কর উপস্থিতি একটি নাটকীয় ঘটানার উদ্ভব করে। মুক্তিবাহিনী বিজয়ী পক্ষ। কাজেই হাত তুলে আত্মসমর্পণের জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। মুক্তি বাহিনীর সংখ্যা তাদের চেয়ে অনেক কম। ওদের কয়েকজন আদেশ মান্য করে হাত তোলে। অন্যরা ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে পড়ে গ্রামের দিকে দৌড়ে চলে যায়। যাবার পথে উন্মত্তের মতো এদিক -ওদিক গুলী ছুড়তে থাকে। অতিকায় দেহধারী এক পাকিস্তানী

www.pathagar.com

সুবেদার ট্রাকের সামনের সিটে বসা ছিল। সে লাফিয়ে পড়ে শফিউল্লাকে ধরে ফেলে। শুরু হয় হাতাহাতি সংঘর্ষ।

অগ্রবর্তী কোম্পানী শাহবাজপুরের দিকে মুক্তি বাহিনীর অবস্থান থেকে এক মাইল এগিয়ে রয়েছে। অবশিষ্ট সৈন্যরা পাইকপাড়ার দিক থেকে ঘটনাস্থল ইসলামপুরের প্রায় এক কিলোমিটার পেছনে।

শত্রুদের চেহারা দেখেই বোঝা যায় ওরা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী এবং ওরা হচ্ছে পাঠান সম্প্রদায়ভুক্ত সৈনিক। সুবেদারটি এ কারণে বেশ তাগড়া গোছের ছিল। তাকে আয়ত্তে নিয়ে আসা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। উভয়ের থলিতে পিস্তল রয়েছে কিন্তু আমরা কেউ তা হাতে নিতে পারছি নে। রানার সিপাহী মান্নান তার স্টেনগান নিয়ে কয়েকবার চেষ্টা সত্ত্বেও লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। কারণ, দু'জনই ধস্তাধস্তি করে চলেছে। কখনো আমি ব্যারেলের মুখোমুখি-পরক্ষণেই সুবেদার। কাজেই সিপাহী মান্নান স্টেনগানের ট্রিগারে চাপ দিতে পারছে না।

এ সময়ে মেজর নসিমের নিতম্বে গুলীবিদ্ধ হয়। সাংঘাতিক আহত মেজর নাসিম। রানার মান্নানের হাঁটুতে গুলী লাগে। বহুক্ষণ পরে এক পর্যায়ে জুডো এবং মুষ্টিযুদ্ধের পদ্ধতি প্রয়োগ করে হাঁটু দিয়ে সুবেদারের কুঁচকিতে আঘাত করলে তার হাত খুলে যায়। আমি সেই সুযোগে প্রবল শক্তি নিয়ে তার চোয়ালে ঘুষি বসিয়ে দেয়। সুবেদার সিটকে পড়ে। আবার সে দ্রুত ঘুরে মান্নানের পেছনে গিয়ে তার স্টেনগানটি আঁকড়ে ধরে। মান্নান বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় ধরাশায়ী। সুবেদার মান্নানকে সামনে রেখে বা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মান্নানের স্টেনগান দিয়েই গুলী ছোড়ে। মাত্র এক গজ দূরে। গুলী ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু গুলীর শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছু আমি উপলব্ধি করা যায় নি। আমাদের একজন সৈনিক দৌড়ে এসে সুবেদারকে গুলী করতে চায়, পারে না। কেননা, সুবেদারটি মান্নানকে বর্ম হিসেবে ধরে রেখেছে।

অনন্যোপায় হয়ে তার হাত থেকে রাইফেলটি কেড়ে নিয়ে এর বাট দিয়ে সুবেদারের মাথায় আঘাত করা হয়। সে মাটিতে পড়ে যায়। সে অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আঘাত করা হয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে। একেবারেই একাকী এবং নিঃসঙ্গ। দু'জন সৈনিক নিহত। মেজর নাসিম মারাত্মক আহত। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার।

www.pathagar.com

অগ্রবর্তী কোম্পানী পেছনে গুলীর শব্দ শুনে ইসলামপুরের দিকে ফিরে আসতে থাকে। পেছনের সৈন্যদল ও সতর্কতার সাথে এগিয়ে আসে। কিন্তু সেসব গ্রুপের যে- কেউ আসার আগে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানী সৈন্যসহ একটি বাস পেছনে এসে থামে। বাস থেকে তারা যখন নামছিল তখন আমি আমার রাইফেল তাদের দিকে তাক করা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম সুবেদারের মাথার মতো রাইফেলেরও একই দশা। এটি ভেঙ্গে গেছে। স্টেনগানটি মান্নানের সাথে রয়েছে। তাকে ডাকলাম। সে নেই। সে হামাগুড়ি দিয়ে স্টেনগানসহ নিরাপদ স্থানে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত একমাত্র পিস্তলটি মরণাপন্ন মানুষের খড়ের মতো শেষ আশ্রয় মনে করে আঁকড়ে ধরি। কিন্তু তাও ব্যর্থ। সুবেদার আমাকে লক্ষ করে যখন গুলি করেছিল তখন দু'টি গুলী আমার পিস্তলে এসে লাগে। পিস্তল বিধ্বস্ত। ত্রাণকর্তাকে থলিতে রেখে উপায়ন্তর না দেখে নিকটবর্তী জলাভূমিতে লাফিয়ে পড়ে এবং কাদার মধ্যে সমস্ত শরীর ঢুকিয়ে দিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকি।

পাকিস্তানী সৈন্যরা বাস থেকে নেমে গ্রামের চারদিকে এবং অভ্যন্তরে অবস্থান নেয় এবং জলাভূমির যেখানে শফি উল্লাহ থাকার চেষ্টা করছে, সেখানেও। তাদের পরনে রয়েছে ধূসর বর্ণের মিলিশিয়া শার্ট এবং খাকি প্যান্ট। শফিউল্লাহর পরনে জলপাই রঙের সবুজ পোশাক। কাদা লেগে তা ধূসর হয়ে উঠেছে। একেবারে স্বাভাবিক ছদ্মবরণ। সহসা বুঝা গেল যে শফিউল্লাহ শত্রু সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করছে। কাছাকাছি সৈন্যদের কেউ নেই। এবার শফিউল্লাহ একেবারে-সত্যিকার অর্থেই অসহায়। এঅবস্থা থেকে জীবন্ত বেরিয়ে আসার কল্পনা করাও অবান্তর। তখন মনে মনে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল যেন তিনি এমন অগৌরবের মৃত্যু না দেন। মৃত্যু যদি একান্তই আসে আসুক, তবে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করে মৃত্যুই ভাল। এসব ভেবে জলাভূমির কাদা মাটি ছেড়ে এক দুরন্ত বিশ্বাসের ওপর ভর করে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়। রাস্তায় উঠে পাকিস্তানী সৈন্যদের সামনে দিয়ে গম্ভীর দৃষ্টিসহ দৃপ্ত পদক্ষেপে প্রায় একশত গজ দূরে নিকটবর্তী গ্রামে একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয়, আর আশা করতে থাকে তার সৈন্যরা তার খোঁজে আসবে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির বিভ্রান্তির কারণে সম্ভবত কেউ এদিকে দিকে দৃষ্টি দেয় নি। আল্লাহ-তায়ালার অসীম করুণায় শফিউল্লাহ বেঁচে গেছে।

www.pathagar.com

অতঃপর মুক্তিবাহিনীর অগ্রবর্তী এবং পেছনের সৈন্যরা দু'দিক থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘেরাও করে হামলা চালায়। প্রচণ্ড গোলাগুলী বিনিময় চলে। বিরাট ক্ষয়-ক্ষতিসহ পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে। সময়ে মুক্তিবাহিনীরা তাদেরকে ধরে ফেলে এবং এ সংঘর্ষে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর ২৫ জন সৈন্য নিহত এবং ১১ জন বন্দী হয়। পরের দিন আরো কিছু সংখ্যক বন্দী হয়। মুক্তি বাহিনীর হতাহতও কম নয়। ২ জন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়। হাবিলদার রফিক এবং সিপাহী মুজিবুর রহমান বীরের মতো আত্মত্যাগ করেন।

হাবিলদার রফিক এবং সিপাহী মুজিবুর রহমান ছাড়াও যারা এ যুদ্ধে প্রশ্নাতীত সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন এদের অন্যতম হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট নজরুল ইসলাম, হাবিলদার আবুল কালাম এবং নায়েক মোস্তফা আলী।

এ যুদ্ধে ডাক্তার লেফটেন্যান্ট মঈনুল আহত হয়। আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা করার মতো ঘটনাস্থলে কেউ ছিল না। ডাক্তার লেফটেন্যান্ট মঈনও আহত। সন্নিকটে একমাত্র চান্দুরায়ই চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই, তাদেরকে পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে-ড্রাইভারের জন্যে অপেক্ষার সময় নেই- শফিউল্লাহ নিজে স্টিয়ারিং ধরে। পেছনের বাহিনী সড়কের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। শফিউল্লাহ যখন তাদের কাছাকাছি পৌছে ওরা পাকিস্তানী সৈন্যদের কেউ মনে করে ট্রাকের ওপরে মেশিনগানের গুলী স্প্রে করতে শুরু করে। ট্রাকটি ছিল পাকিস্তানীদের বহন করা প্রথম গাড়িটি। যুদ্ধে এ ধরনের অকারণ আকস্মিক উদ্বেগ, আতংক, বিভ্রান্তি এবং ঝুঁকি প্রদর্শন নতুন কিছু নয়।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, একজন মুক্তিসেনা শফিউল্লাহকে সনাক্ত করে গুলীবর্ষণ বন্ধ করে দেয়। অপেক্ষা করার মতো বিন্দুমাত্র সময় নেই। ছুটে যেতে হবে চান্দুরা। ছুটে যেতে হচ্ছে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা দেয়ার জন্যে। দূরন্ত বেগে ট্রাক নিয়ে ছুটে চলে।

না, বিপদ কাটেনি। কিছু দূর যেতেই আবার একই সন্দেহ। শেষ কোম্পানীর আরেকটি সৈন্যদল এগিয়ে আসছে। মুক্তিবাহিনীরা ভাবছে পাকিস্তানী সৈন্যের ট্রাকটি পালিয়ে যাচ্ছে। শফিউল্লাহ কোনো রকমে চলন্ত অবস্থায়ই আমার টুপি নেড়ে তাদেরকে আমার পরিচয় জানিয়ে দেয়। ওরা গুলী বর্ষণ থেকে বিরত হয়। ট্রাকের সম্মুখভাগের আয়না টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আশ্চর্য, একটি ভাঙ্গা টুকরাও গায়ে লাগে নি।

www.pathagar.com

আবার নিরাপদ। দ্রুতবেগে চান্দুরা পৌঁছে গেল। এই ধারাবাহিক অলৌকিক অবস্থার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। শুধু এতোটুকুই বলা যায় যে, পরম করুণাময়ের অপার রহমতে শফিউল্লাহ বারংবার অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে চলেছি।

চান্দুরায় কোনো হাসপাতালের ব্যবস্থা নেই। স্থানীয় ডাক্তারের মাধ্যমে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর স্ট্রেচারে করে তাদের আগরতলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ভয়ংকর ক্ষত নিয়ে মেজর নাসিমের পক্ষে ব্যাটালিয়ন কমান্ড চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। এখনো তার দেহ থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে। স্ট্রেচারে করে মেজর নাসিমকে আগরতলায় পাঠিয়ে দেয়ার সময় অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে সে বলে, "স্যার, আমি চলে গেলে আমার ব্যাটালিয়ন এবং সৈনিকদেরকে দেখবেকে! অনুগ্রহ করে আমাকে তাদের সাথে থাকতে দিন।

অবিলম্বে মেজর নাসিমের অস্ত্রোপচারজনিত চিকিৎসা প্রয়োজন। তারপরেও বিদায় নেয়ার মুহূর্তে নাসিমের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কমান্ডার এবং সহযোদ্ধাদের প্রত্যেকের মধ্যে এ ধরনের অনুভূতি, অনুরাগ এবং দায়িত্ববোধের দুর্লভ প্রকাশ বরাবরই বিরাজ করেছে।

ব্যাটালিয়ন কমান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পরবর্তী সিনিয়র অফিসার হচ্ছে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী। কিন্তু চান্দুরার উত্তর- পূর্বের রাস্তায় প্রতিবন্ধক তৈরির ব্যাপারে সে যদি তার দায়িত্ব পালন করে প্রতিবন্ধক অবস্থানে থাকত তা হলে পাকিস্তানী সৈন্যরা বিনা বাধাঁয় এখানে পৌঁছতে পারত না। যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোনো সৈনিকের পক্ষে এ হচ্ছে এক অমার্জনীয় অপরাধ।

মুক্তিবাহিনীতে সীমিত সংখ্যক বেতারযন্ত্র ছিল। পেছনে অগ্রসরমান হেড কোয়াটারের সাথে রানারের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখা হচ্ছিল। ব্যাটালিয়ন কমান্ড করার জন্যে অবিলম্বে একজন অফিসার প্রয়োজন।

ইসলামপুর এবং চান্দুরার আশপাশে ব্যাটালিয়নকে সংহত এবং পুনর্বিন্যাস করার জন্যে এডজুটেন্টকে পরামর্শ দিয়ে কাউকে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডের দায়িত্ব ন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে শফিউল্লাহ পশ্চাদ্ভাগে রওনা হয়। পরদিন ভোরে চান্দুরায় পৌঁছে এবং ক্যাপ্টেন মতিনকে সাথে নিয়ে এসে তাকে কমাণ্ডের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।।

www.pathagar.com

আগের দিন, যখন ইসলামপুরে হামলা করার ব্যাপারে সাই ব্যস্ত ছিল পাকিস্তানীরা তখন শাহবাজপুর সেতুটি ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে অগ্রাভিযান ২৪ ঘন্টার জন্যে ব্যাহত হয়।

ক্যাপ্টেন মতিন তাৎক্ষণিকভাবে তিতাস নদী পাড়ি দিয়ে অভিযান শুরু করতে পারে নি। কারণ, এর আগে তার জানা প্রয়োজন প্রতিপক্ষের শক্তি কতোটা সেখানে এবং এও জানা দরকার কীভাবে ওদের সৈন্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী ভুঁইয়াকে নির্দেশ দেয়া হয় প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধ করতে। তিতাস পাড়ি দেয়াসহ অথবা ঐ রাতেই পর্যবেক্ষণ মিশন প্রেরণের জন্যে। ৮ ডিসেম্বরে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে শত্রুরা তিতাস অঞ্চল থেকে বহু দূরে সরে গেছে এবং ক্যাপ্টেন সুবেদ আলী সেখানকার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ব্যাটালিয়ন অবিলম্বে তিতাস নদী অতিক্রম করে প্রবল বেগে সরাইলের পথে এগিয়ে চলে। সামনে রয়েছে ক্যাপ্টেন সুবেদ আলীর কোম্পানী।

৫৭তম ভারতীয় মাউন্টেন ডিভিশন ৮ ডিসেম্বরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছে। পাকিস্তান বাহিনী এর আগেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে চলে যায়। যুগপৎভাবে 'এস' ফোর্স ও বিনা বাধায় সরাইলে পৌঁছে। এ সময়ে বোঝা যায় যে, পাকিস্তানী সৈন্যদের আর যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই। ওরা জীবনের নিরাপত্তার জন্যে ছুটে চলছে এবং বিভিন্ন স্থানে অধিকতর সংখ্যায় সমবেত হচ্ছে। এ সেক্টরে জীবিত সকল পাকিস্তানী সৈন্য আশুগঞ্জ এবং ভৈরববাজারে একত্রিত হচ্ছে।

ভারতীয় বাহিনী এবং 'এস' ফোর্স উভয়েই আশুগঞ্জের দিকে প্রবল বেগে এগিয়ে চলে। ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যার, মধ্যে ১১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আশুগঞ্জের পূর্ব পাশে আজবপুর এবং দুর্গাপুরে সমাবেশ করে। সরাইল এবং শাহবাজপুরের মধ্যে ২য় ইস্ট বেঙ্গল এবং সেক্টরভুক্ত এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য পেছন দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকে। ভারতীয় ৩১১তম মাউন্টেন ব্রিগেডের ১০তম বিহার রেজিমেন্টসহ দুর্গাপুরের দক্ষিণে আশুগঞ্জের নিকটে সমবেত হয়। দুর্গাপুর এবং তালশহরের মধ্যে ১৮তম রাজপুত এবং তালশহরে ৪র্থ গার্ড রেজিমেন্ট। ব্রাহ্মবাড়িয়া থেকে যায় ভারতীয় বাহিনীর ৭৩ তম মাউন্টেন ব্রিগেড।

www.pathagar.com

মুক্তিবাহিনীর পক্ষে আশুগঞ্জের দিকে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দূরপাল্লার কামান থেকে বিরামহীন গোলাবর্ষণ চলছে। ভারতীয় বাহিনীর কামান তখনো পেছনে-আগরতলা এবং সিঙ্গারবিলের মধ্যে কোথাও রয়ে গেছে এবং মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে একটি তাৎক্ষণিক বিপত্তি।

৯ ডিসেম্বর, 'এস ফোর্স' এবং ৩১১ তম মাউন্টেন ব্রিগেড চুপিসারে এবং দৃঢ়তার সাথে আশুগঞ্জের দিকে এগিয়ে চলে। আশুগঞ্জ এবং ভৈরববাজারে পাকিস্তানী সৈন্যদের শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। ১৪ তম ডিভিশনের সদর দফতর রয়েছে সেখানে। এবং এটি হচ্ছে পিছু-হটে যাওয়া বাহিনীর শক্তির প্রতীক। কিন্তু তাদের যুদ্ধ করার মতো আর কোন সহ্যশক্তি নেই। তাদের কেবলমাত্র দূরপাল্লার কামান গর্জে চলছে।

আশুগঞ্জ আক্রমণ করার ব্যাপারে ১৮তম রাজপুত একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং তা করতে গিয়ে সেখানে এক মারাত্মক ফাঁদে আটকে যায়। দু'পাশে শত্রুর আবেষ্টনী থেকে রাজপুত রেজিমেন্টের বেরিয়ে আসা খুবই কষ্টকর। এ পরিস্থিতি থেকে রাজপুতকে উদ্ধার করার জন্যে ১০ ম বিহার এবং ১১তম ইস্ট বেঙ্গল দুর্গাপুরের দিক থেকে আশুগঞ্জ আক্রমণ করে। এ আক্রমণে সহযোগী হয় ভারতীয় এক স্কোয়াড্রন পিটি-৭৬ ট্যাংক। এটি এক সংকল্পবদ্ধ আক্রমণ। শত্রুবাহিনী তাদের এন্টি-ট্যাংক কামান ব্যবহার করে। বামদিকে হুমকি সৃষ্টি করার ফলে ১৮তম রাজপুত শত্রুব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু বড়ো বেশি কড়া মাশুল দিয়ে। ৫টি ট্যাংক ধ্বংস হয়। তদুপরি, মৃত এবং আহতদের সংখ্যা অনেক। এর পরক্ষণেই সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তান সেনা বাহিনী ভৈরব বা মেঘনা সেতুর আশুগঞ্জ দিকের একাংশ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এর ফলে সেতুর একটি স্প্যান নদীতে পড়ে যায়।

নিজস্ব গোলন্দাজ সহকারিতার অভাবে যুদ্ধ গতিহীন হয়ে পড়ে। এবং দিনের শেষে, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে, ১০ ডিসেম্বর, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভৈরবে হটে যায়। এতোটুকু বিরতি না দিয়ে হেলিকপ্টারে ভারতীয় ১৬তম পাঞ্জাবের দু'কোম্পানী সৈন্য, মেঘনার তীরে অবতরণ করান হয়। ১১ ডিসেম্বর, ১১ টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তানী সৈন্যরা মেঘনা সেতুর ভৈরব দিকের একাংশ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এর ফলে সেতুর দু'টি স্প্যানই ধ্বংস হয়ে নদীতে পড়ে যায়। ভৈরব অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

একই সময়ে ভৈরবে অবস্থান অব্যাহত রাখতে হবে এবং পাশ কেটে এগিয়ে যেতে হবে। 'এস' ফোর্সের একটি ব্যাটালিয়ন অর্থাৎ ১১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ৭৩তম ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেড ভৈরবে পাকিস্তানী সৈন্যদের অবরোধ করে রাখার জন্যে পেছনে থেকে যায়। অন্যদিকে, ৩১১তম ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেড এবং 'এস' ফোর্সের অবশিষ্ট অংশ নরসিংদীর দিকে অগ্রসর হয়।

বিজয় অভিযান ঃ নরসিংদী থেকে ঢাকার পথে

ভারতীয় ৪র্থ গার্ডস রেজিমেন্ট হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নরসিংদী অবতরণ করে। পরবর্তী সময়ে ১০ম বিহার রেজিমেন্ট, ১৮তম রাজপুত রেজিমেন্ট এবং ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ 'এস' ফোর্স এবং ৩ নম্বর সেক্টরের সৈন্যদল এর সাথে যুক্ত হয়।

১২ ডিসেম্বর, ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রায়পুরা পৌঁছে। 'এস' ফোর্সের সদর দফতর এই ব্যাটালিয়নের সাথে থাকে। পরের দিন বিকেলে অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী নরসিংদী পৌঁছলে ভারতীয় গার্ডস রেজিমেন্ট মুক্তিবাহিনীর স্বাগত জানায়। ওরা আগেই প্রায় বিনাবাধায় ১১ ডিসেম্বর নরসিংদী শিল্প এলাকা দখল করে নিয়েছে। নরসিংদীর যাবতীয় যানবাহন গার্ড রেজিমেন্ট নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

মুক্তিবাহিনীর একমাত্র নিয়মিত ব্যাটালিয়ন -২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নরসিংদী অবস্থানের জন্যে সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ড নির্দেশ দেয় এবং ভারতীয় ৩১১তম ব্রিগেডের ঢাকার দিকে মার্চ করে এগিয়ে চলা অব্যাহত থাকবে। এ হচ্ছে এক অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। মুক্তিবাহিনীর পেছনে ফেলে রাখার কোনো যুক্তি নেই। ঢাকা মুক্তির জন্যে অগ্রসরমান বাহিনীসমূহের যেসব বাহিনী পুরোভাগে রয়েছে তাদের মধ্যে মুক্তিবাহিনীরও অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। অতএব সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডকে জানিয়ে দিই, মুক্তিবাহিনী নরসিংদী ফেলে রাখা চলবে না। এর মধ্যে মুক্তি বাহিনীর সকল অফিসার ও সৈনিকের প্রতিধ্বনি রয়েছে। কাজেই ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সিদ্ধান্তে আমি অনড়, থাকার কারণে সম্মিলিত বাহিনী কমান্ড মনোভাব, সদিচ্ছা এবং প্রবল আকাঙ্ক্ষার মূল্যায়ন করে মুক্তিবাহিনীর প্রস্তাবে সম্মত হয়।

www.pathagar.com

ভারতীয় গার্ডস্ রেজিমেন্ট -এর নেতৃত্বে ব্রিগেড কলামাটি, নরসিংদী, ডেমরা তারাব সড়কে ঢাকার দিকে রওনা হয়। 'এস' ফোর্সও সেক্টরের বাহিনীসহ নরসিংদী -ভুলতা-মুড়াপাড়ার পথ ধরে রূপগঞ্জে শীতলক্ষা পাড়ি দিয়ে পূর্বদিকে ঢাকা নগরীসহ ক্যান্টনমেন্টের দিকে অগ্রসর হয়।

১৩ ডিসেম্বর রাতেই মুক্তিবাহিনী মুড়াপাড়ায় এবং সেদিনই অগ্রবর্তী সেনাদল শীতলক্ষা ও বালু নদী অতিক্রম করে ঢাকার ৫-৬ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়।

বালু নদীর পূর্বদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের বহির্দেশ পরিসীমায় এক প্রবল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বাসাবো এবং খিলগাঁও এলাকার চারদিকে আগে থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফিল্ড ডিফেন্স বা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে সর্বাত্মক ব্যবস্থাসহ অবস্থান করছে। 'এস' ফোর্স এবং সেক্টর সেনাদল চূড়ান্ত হামলার জন্যে পর্যায়ক্রমে মোতায়েন হওয়া শুরু করে।

১৪ ডিসেম্বর, সম্মিলিত কমান্ডের অধীনে সৈন্যদের বিন্যাস হচ্ছে এরকমঃ

১. ভারতীয় ৪র্থ গার্ডস, রেজিমেন্ট এবং ১৮ তম রাজপুত রেজিমেন্ট তারাতো'য় শীতলক্ষার পূর্ব তীরে পৌঁছে,

২. রূপসীতে ১০ ম বিহার রেজিমেন্ট,

৩. পূর্বগাঁও এবং ডেমরার পশ্চিমে বালু নদীর অপর পাড়ে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট,

৪. বাসাবো এবং খিলগাঁওয়ের আশপাশে ৩ নম্বর সেক্টরভুক্ত সেনাদল,

৫. তারাবো'র পূর্ব দিকে বরপা এলাকায় একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী।

ঢাকা- ডেমরা সড়ক তখনো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলে। ভারতীয় ৩১১তম ব্রিগেড-এর অগ্রগতি দু'দিন থেকে নিশ্চল অবস্থায় রয়েছে। ওরা ১৬ ডিসেম্বর, ভোরবেলা পর্যন্ত শীতলক্ষার পূর্ব তীর থেকে নদী পাড়ি দেয়ার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুক্তিবাহিনী বাসাবো এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের মুখোমুখি হয় এবং ১৪ ডিসেম্বর রাতে ভয়ংকর যুদ্ধ চলে। পাকিস্তান বাহিনী বেপরোয়া হয়ে দৃঢ়তার সাথে শেষ চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু ওরা ঢাকা থেকে নতুন সংযোজন প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘসময় অব্যাহত অবস্থান চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

সম্মিলিত বাহিনীর দূরপাল্লার কামানসমূহ ঢাকার ওপরে অবিরাম গোলাবর্ষণ করে চলেছে। অন্যদিকে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীর যাবতীয় কামান রয়েছে বহু দূরে সীমান্ত এলাকায়। তার কাছে যথেষ্ট সৈন্য রয়েছে। নেই শুধু মুক্তিবাহিনীর এগিয়ে চলার পথকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উপযোগী দূরপাল্লার অস্ত্রশস্ত্র।

এখন বোঝা যাচ্ছে জেনারেল নিয়াজী দূরপাল্লার অস্ত্রসস্ত্র না থাকার ফলে উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতিতে কী ধরনের দুর্দশায় রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ঠিক একই ধরনের অবস্থার শিকার হয়েছেন এ যে ভুল, এই যে ত্রুটি এবং এই যে অদূরদর্শিতা -এর জন্যে জেনারেল নিয়াজী নিজেকে ছাড়া আর কাকে তিনি দোষারোপ করতে কিংবা অপবাদ দিতে পারেন না। পারেন শুধু নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে।

ধাবিত করার যেকোন অপারেশন বা তৎপরতায়-বিশেষত, মুক্তিবাহিনী যে-পরিস্থিতিতে রয়েছে সর্বোচ্চ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে সময় এবং ব্যাপ্তি-স্থান। ঢাকায় উপনীত হওয়ার দৌড় ঊর্ধ্বশ্বাসে তথা তীব্রতম গতিতে-এমনকি বঙ্গোপসাগরের দিকে অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে ছুটে আসা মার্কিন রণতরী 'এন্টারপ্রাইজ'-এর চেয়েও গতিসম্পন্ন করা সমীচীন ছিল। এও হচ্ছে গতিবেগ সম্পর্কিত রণকৌশল গৃহীত হওয়ার অন্যতম কারণ।

৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব আর গোপন ছিল না-প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জ্যাক এন্ডারসন এ বিষয়টি বিশ্বের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। উক্ত নীতি অনুযায়ী বিশাল শক্তিসম্পন্ন সপ্তম নৌবহরকে অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরে প্রস্তুত থাকার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই, সম্মিলিত বাহিনীর প্রবল গতিময়তার ওপরে প্রাধান্য আরোপ করা হয়।

মেজর জেনারেল এইচ. এম. আনসারীর ১৬তম ডিভিশনকে বিভিন্ন স্থানে পরিব্যাপ্ত অবস্থায় পদ্মা নদীর পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১১ তম কোর কোণঠাসা, বিচ্ছিন্ন এবং অবরোধ করে ফেলেছে। ভারতীয় ৩৩ তম কোর হিলি দখল করে প্রবলবেগে যমুনা-পদ্মার মোহনায় উপস্থিত হয়েছে। ভারতীয় ১০১ তম কমিউনিকেশন জোন যখন তুরা থেকে দক্ষিণ

www.pathagar.com

দিকে বিদ্যুৎগতিতে ঢাকার পথে অগ্রসর হয়, তখন সবকিছু ছাপিয়ে, দৃশ্যান্তরে, বৈদ্যুতিক রণকৌশল পাকিস্তান বাহিনীর মনোবল ধ্বস নামিয়ে দেয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে, পূর্ব দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪র্থ কোর-এর তিন ডিভিশন সৈন্য তিনটি কলাম-এ বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হয়। উত্তর-পূর্বে এক ডিভিশনের কলাম শিলচর-সিলেট সড়কপথে সিলেটে পৌঁছে। 'জেড' ফোর্স এ অভিযানের সাথে সংযুক্ত। দক্ষিণ-পূর্বে আরেক ডিভিশন দু'টি কলাম-এ কুমিল্লা-চট্টগ্রাম দখলের জন্যে সাঁজোয়া বহরে ছুটে চলে। এই অক্ষ রেখায় 'কে' ফোর্স ও সংযুক্ত ছিল। পূর্ব দিক থেকে ৫৭ তম মাউন্টেন ডিভিশন এবং 'এস' ফোর্স দুর্বার গতিতে ভৈরবে এসে শত্রুদের অবরুদ্ধ করে এবং ঢাকা অগ্রসরের রাস্তায় পৌঁছে যায়। সারা দেশে এখানে সেখানে সর্বত্র যেন সম্মিলিত বাহিনীর মহাপ্লাবনে পাকিস্তান বাহিনী চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

যখন ঢাকার চারদিকে পরিবেষ্টিত ফাঁস নজিরবিহীন গতিতে ঘড়ির কাঁটার মত নিখুঁতভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এ এম মানেকশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমাণ্ডের উদ্দেশে প্রচারিত এক রেডিও বার্তায় পাকিস্তান বাহিনীর অবশ্যম্ভাবী আত্মসমর্পণের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। এর ফলে পাকিস্তানী বহু কমাণ্ডার এবং সৈন্যেদের মনে ব্যাপকভাবে ভীতির সঞ্চার হয়। একটি মাত্র ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় রাজধানী ঢাকায় যেখানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী অহমিকার সাথে বললেন- "আমার মৃতদেহের ওপরেই কেবল ঢাকার পতন হতে পারে।" এ ঘোষণা পাকিস্তানীদের নিজেদের বাসভূমে প্রচারণা অভিযানের মূল্য বহন করে। বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর দ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হচ্ছেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। তিনি পাকিস্তানী সৈন্যদের নিরাপদ অপসারণের ব্যবস্থা করার জন্যে জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান তা বাতিল করে দেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী হচ্ছেন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বা প্রেসিডেন্টের প্রতিভূ মাত্র। তিনি শুধু জেনারেল ইয়াহিয়ারই প্রতিধ্বনি করেন। তার আশপাশে কিংবা বাংলাদেশের সর্বত্র যা ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে তিনি নির্বিকার।

www.pathagar.com

১৬ ডিসেম্বরে সূর্য উদিত হয় পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রসঙ্গ নিয়ে। ১৫ ডিসেম্বর, মিত্র বাহিনীর বোমাবর্ষণ সাময়িকভাবে বন্ধ করার জন্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী স্বাক্ষরিত প্রস্তাবের সময়সীমা হচ্ছে ১৬ ডিসেম্বর, সকাল ৯ টা পর্যন্ত। তদনুযায়ী একটি রেডিও তরঙ্গ ব্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীকে আত্মসমর্পণ করা বা না করা সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত উক্ত ব্যান্ড-এ প্রচার করার শর্তারোপ করা হয়। অবরুদ্ধ পাকিস্তান পূর্বাঞ্চল কমান্ড চূড়ান্ত সময়সীমা আরো ৬ ঘন্টা বাড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাব করলে, জেনারেল মানেকশ তার সম্মতি সকাল ১০ টার সময় বেতারযোগে অবহিত করেন।

পরিস্থিতি এখন দ্রুত মোড় নেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ড এর প্রধান স্টাফ অফিসার মেজর জেনারেল জেকব অপরাহ্ন ঠিক ১ টার সময় আত্মসমর্পণের শর্তাবলি সম্পর্কিত দলিল নিয়ে হেলিকপ্টারে ঢাকায় পৌঁছেন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী শর্তাবলিতে ২টা ৪৫ মিনিটে অনুস্বাক্ষর করলে আত্মসমর্পণ দলিলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরের সময়সূচি নির্ধারিত হয় ৪ টা ৩০ মিনিট।

১টা ৪৫ মিনিটে ডেমরায় অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যরা সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বেলা ২টায় ডেল্টা সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং শফিউল্লাহকে জানায় যে, মিত্র বাহিনীর ৫৭তম মাউন্টেন ডিভিশন থেকে তার কাছে বার্তা এসেছে-বেলা ৩ টা ৩০ মিনিটে কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান লেপটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরাকে স্বাগত জানানোসহ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে ৩১১ তম মাউন্টেন ব্রিগেডিয়ার কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার মিস্ত্রাও অনুরূপ সংবাদ পৌঁছায়। তাই মঈনকে ২য় ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়।

ডেমরা-ঢাকা সড়ক তখনো নিরাপদ নয়। পরাজিত বাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত নার্ভাস হয়ে-আবার কখনো, প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে,ট্রিগারের ওপর আঙ্গুল রেখে বসে আছে। তার সৈন্যদের মাঝ দিয়ে শফিউল্লাহর সহযাত্রী হিসাবে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ডেমরা এলাকার পাকিস্তানী ব্যাটালিয়ন কমান্ডার কর্নেল খিলজীকে সাথে নিল। প্রায় আড়াইটায় কর্নেল খিলজীর গাড়িতে করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্য দিয়ে রওয়ানা হয় এবং পাকিস্তানী

www.pathagar.com

সৈন্যদের গুলিতে বাঁধা প্রাপ্ত হয়। কর্নেল খিলজীর সহায়তায় সে বাঁধা অতিক্রম করে ৩টা ৩০ মিনিটে বিমানবন্দরে পৌঁছে। ঢাকা বিমানবন্দর যুদ্ধবিধ্বস্ত মাঠের আকার ধারণ করেছে। তবু বিজয় দিবসে এর মধ্যে স্বাগতসূচক মৃদু হাসির ঝলক যেনো ফুটে উঠেছে।

সম্মিলিত বাহিনী প্রধান জেনারেল আরোরাকে যারা সাদর সম্ভাষণ জানাতে এসেছে এদের মধ্যে জেনারেল নিয়াজী হচ্ছেন সকল দৃষ্টির কেন্দ্র। বিষণ্ন এবং অবদমিত তার মুখাবয়ব। পরাজিত একজন সেনাপতিকে প্রত্যক্ষ করার মতো এ হচ্ছে এক অভিজ্ঞতা।

তার পরাজয় শুধু পরাজয়ই নয় পরাজয়েও এক ধরনের দীপ্তি আছে- জেনারেল নিয়াজীর তাও ছিল না।

বিমান বন্দরে তেমন অপেক্ষা করতে হল না। আকাশে দেখা দিল একটি হেলিকপ্টার বহর। টারমাকে অবতরণ করল সদলবলে জেনারেল আরোরা। তাঁর দলে রয়েছেন বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ [অপারেশন] গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল করিম খন্দকার। বিমানবন্দরের অনুষ্ঠানপর্ব শেষে রমণা রেসকোর্সের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

রেসকোর্সে সমবেত বিশাল জনতার জয়ধ্বনি-জয়বাংলা ধ্বনির মধ্যে আত্মসমর্পণ দলিলে সই করেন আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, জেনারেল, মার্শাল ল' প্রশাসক, জোন বি এবং কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড [পাকিস্তান] এবং জগজিৎ সিং অরোরা, জেনারেল, অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ, ইন্ডিয়ান এন্ড বাংলাদেশ ফোর্সেস ইন দ্য ইস্টার্ন থিয়েটার। তারিখ, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। এ হচ্ছে উৎসবের দিন। এ হচ্ছে আনন্দের দিন। এ হচ্ছে বিধাতার উদ্দেশ্যে শোকরিয়া জ্ঞাপনের দিন। এ হচ্ছে এক সমুদ্র রক্ত থেকে উত্থিত বাংলাদেশের বিজয় দিবস।

www.pathagar.com

জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণ

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি) ১৫ ডিসেম্বর তার সান্ধ্যকালীন সংবাদ প্রচার অনুষ্ঠানে ঘোষণা করে যে, ভারত জেনারেল নিয়াজির অনুরোধে বিকেল পাঁচটা থেকে পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে। পরে ১৬ ডিসেম্বর ভোর চারটায় ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার নিয়াজিকে ঢাকা সদর দফতর হতে প্রেরিত একটি বেতার বার্তা নিজস্ব বেতার যন্ত্রে ধরেন। ওই বার্তায় ভোর পাঁচটা থেকে যুদ্ধ বিরতির পরামর্শ দেয়া হয়। জেনারেল নাগরা বার্তাটি বিগেডিয়ার ক্লেয়ারের কাছ থেকে পান ১৬ ডিসেম্বর সকাল ছ'টায়।

দ্রুত ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের সম্ভাব্যতা জরিপের উদ্দেশ্যে জেনারেল নাগরা ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ও ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিংকে নিয়ে মিরপুর সেতুর পূর্বে ২ প্যারা ব্যাটালিয়নের অবস্থানে যান। সেখানে পৌঁছলে তাদেরকে জানানো হয়, ১৬ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটা থেকে কোন গোলাগুলি বিনিময় হয় নি।

বেতার বার্তা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের ভীতিজনক নীরবতা জেনারেল নাগরাকে রীতিমতো ধাক্কা মারে এবং মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে নিয়াজির জন্য একটি চিরকুট লিখে নিজের এডিসি ও ব্যারা প্যাটালিয়নের দু'জন অফিসারকে তার কাছে পাঠান। চিরকুটে তিনি লেখেন: "প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এখানে। খেলা শেষ। আমি পরামর্শ দিচ্ছি, নিজেকে আপনি আমার হাতে সমর্পণ করুন এবং সকল দায়-দায়িত্ব আমার।" নাগরা কয়েক বছর আগে পাকিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসে মিলিটারি অ্যাটাকে ছিলেন। সেই সময়ে নিয়াজির সঙ্গে তার আলাপ হয়। নাগরায় এডিসি ও ২ প্যারা ব্যাটালিয়নের এ্যাডজুট্যান্ট একটি জিপে সাদা পতাকা উড়িয়ে সকাল ন'টায় মিরপুর সেতু অতিক্রম করে। তারা দেড় ঘন্টা পর ফিরে আসে। তাদেরকে অনুভরণ করে একটি স্টাফ জিপ। তাতে ছিলেন পাকিস্তান ৩৬ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জামশেদ। ঢাকা দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব ছিল তার ওপর অর্পিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনাকে

www.pathagar.com

এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সাদা পতাকাবাহী একটি জিপে ছিল একজন পাকিস্তানী ক্যাপটেন। সে জেনারেল নাগরার জন্য বার্তা বয়ে আনছিল। বার্তাটি হল : "জেনারেল জামশেদ সেতুর ওপারে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।" প্যারা ব্যাটালিয়নের অতি উৎফুল্ল কয়েকজন জওয়ান জিপটিকে লক্ষ্য করে রাইফেলের ট্রিগার টিপে বসে। এতে গাড়িতে বসা একজন ভারতীয় মেজর মারা যায় এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে নিয়াজির প্রতিনিধি হিসেবে যে পাকিস্তানী অফিসারটি গাড়িতে ছিল, সে সামান্য আহত হয়।

নাগরা, ক্লেয়ার, সন্ত সিং এবং কাদের সিদ্দিকী জামশেদের গাড়িতে গিয়ে বসেন এবং গেলেন জামশেদের সদর দফতরে। সেখান থেকে তারা নিয়াজির সদর দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ১৬ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় নিয়াজির অফিস প্রাঙ্গণে হাজির হন। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকার। কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর ও চতুর্থ কোর-এর সদর দফতরে বার্তা পাঠিয়ে দিয়ে জেনারেল নাগরা সোজা জেনারেল নিয়াজির সদর দফতরে আসে। নিয়াজি ছিলেন তার ভু-গর্ভস্থ বাঙ্কারে। সেখান থেকে চলে আসেন সদর দফতরের অফিসে।

নাগরাকে দেখে নিয়াজি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন : 'পিন্ডিমে তিথি হুয়ে হারামজাদো নে মারওয়া দিয়া (পিন্ডির উর্ধ্বতন সদর দফতরের হারামজাদারা আমাকে ডুবিয়েছে)" নাগরার কাঁধে হাত রেখে কাঁদছিলেন নিয়াজি। ঘাড় ঘুড়িয়ে ক্লেয়ারের দিকে তাকালেন। তার মাথায় ছিল তামাটে রংয়ের পাগড়ি ও উইং। তার কাছে জানতে চাইলেন তিনি টাঙ্গাইলে প্যারা ব্রিগেড নামানোর অধিনায়কত্বে ছিলেন কিনা। নিয়াজি বলেন: তাঁকে জানানো হয় ভারতীয়রা এক ব্যাটালিয়ন প্যারাস্যুটবাহী সৈন্য নামিয়েছে। তিনি সে কথা বিশ্বাসই করেন নি।" নিয়াজি ক্লেয়ারের কাছে তার রেজিমেন্টের নাম জানতে চান। তাকে যখন বলা হয় ক্লেয়ার সিগন্যাল কোর-এর লোক। তখন তিনি বিদ্রুপাত্মক সুরে বলেন যে, "তাদের সেনাবাহিনী কখনোই সিগন্যাল অফিসারদের হাতে ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেবে না।" এ কথায় শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে ক্লেয়ার বলেন : "তাতে কী হয়েছে? যুদ্ধে তো আপনি হেরে গেছেন।"

www.pathagar.com

২ প্যারা ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বে নাগরার সৈন্যরা দ্রুত শহরে প্রবেশ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোয় অবস্থান নেয়। আত্মসমর্পণের শর্ত এবং আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিষয়ে নিয়াজির সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব হেলিকপ্টারে করে বেলা ১ টায় ঢাকায় পৌঁছেন। রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিকাল ৪ টা ৩১ মিনিটে আত্মসমর্পণ দলিলে ভারতের পক্ষে জেনারেল অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে জেনারেল নিয়াজি সই করেন। অন্যান্যের মধ্যে আত্মসমর্পণের এই অনুষ্ঠানে বিমান বাহিনীর এয়ার মার্শাল দেওয়ান এবং নৌবাহিনীর অধিনায়ক ভাইস এডমিরাল কৃষ্ণানহ এ রণাঙ্গনে বিমান ও নৌবাহিনীর পদস্থ অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুক্তি বাহিনীর হাই কমান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপটেন খন্দকার।

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিয়াজির মনোনয়ন পাকিস্তানের জন্য এক দুর্ভাগ্য বলে প্রমাণিত হয়। তিনি এক দূরদৃষ্টিরহিত ব্যক্তি এবং প্রদেশের পরিস্থিতির সঠিক প্রকৃতি উপলব্ধিতে ছিলেন অক্ষম। সীমান্ত চৌকিতে প্লাটুন এবং কোম্পানি নিয়োগ পর্যায়ের কার্যক্রমের ভেতরেই সীমিত ছিল তার চিন্তা শক্তি। ফলত যে ধরনের সামরিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি তাকে হতে হয়, তার বিশালত্ব অনুধাবনে তিনি ব্যর্থ হন। সৈনিক হিসেবে সাহসী ছিলেন এবং গোলাগুলির মধ্য অগ্রবর্তী সৈন্য অবস্থান পরিদর্শনে বেরুবার মতো দুঃসাহসিকতার পরিচয়ও দিয়েছেন, তথাপি কারো মনে প্রেরণা জাগাতে পারেন নি এবং কার্য পরিচালনা করেছেন উঁচু অবস্থান থেকে।

অন্যদিকে তিনি পার্থিব আমোদ-প্রমোদ এবং জাঁকজমক বেশি পছন্দ করতেন এবং পদমর্যাদা প্রদর্শনের বাতিক ছিল। এই প্রদর্শন তিনি খোলাখুলিভাবেই করতেন। তিনি নিঃসন্দেহে এই কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি ছিলেন না। শুরুর আগেই তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন।

নিয়াজির মনে পরাজয় ভীতি ৬ ডিসেম্বর থেকে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হবার দু'দিন পর থেকেই। পরিস্থিতি অবগত করানোর জন্য রাওয়ালপিন্ডির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে বার্তা তিনি প্রেরণ করেন, তাতে ভীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতে তিনি জানান যে, ভারত প্রদেশে ৮টি পদাতিক ডিভিশন, ৪ টি সাঁজোয়া রেজিমেন্ট, ৩৯টি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন এবং ৬০ থেকে ৭০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আক্রমণ করেছে।

www.pathagar.com

প্রাধান্য বিস্তারকারী বিমান শক্তির মুখে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আকাশেই ঘায়েল হয়েছে। ফলত ভারতীয় বিমান বাহিনী স্বাধীনভাবে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় স্থল বাহিনীকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে আকাশ থেকে রকেট নিক্ষেপ করে, নাপাম বোমা বর্ষণের মাধ্যমে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় হয়ে গেছে। তারা সেতু, ফেরি এবং যোগাযোগ রেখাসমূহের ওপর আঘাত করে চলেছে। যেহেতু তারা ব্যাপকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটিয়েছে সে কারণে সরবরাহের পুনঃভাণ্ডারজাতকরণ, বাহিনীর পুনঃসমাবেশকরণ এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হচ্ছে না।

জেনারেল নিয়াজি অবশ্য পাকিস্তানী হাই কমান্ডকে এ আশ্বাস দেন যে, এখনো তার সৈন্যরা সচেতন রয়েছে, ভারতীয় পক্ষে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে চলেছে, তদের হতাহত হচ্ছে অনেক এবং তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তিনি তাদেরকে আরো জানান, তার সৈন্যরা পশ্চাতের রক্ষামূলক অবস্থানে পশ্চাদপসরণ করবে এবং দুর্গ রক্ষাব্যবস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। তিনি পুনরুল্লেখ করেন যে, তিনি এবং তার সৈন্যরা "শেষ মানুষটি এবং শেষ গুলিটি নিয়ে লড়বে।"

এ বার্তাটি ভারতীয় বেতার তরঙ্গ বাধা প্রদানকারী সার্ভিস সংগ্রহ করে। এবং এটা জেনারেল নিয়াজি এবং তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগের অস্ত্র হিসেবে। বিস্তারমান ভারতীয় আক্রমণ রেখার ক্রমবর্ধমান চাপে রাওয়ালপিন্ডির জন্য জেনারেল নিয়াজির প্রেরিত বার্তায় অধিকমাত্রায় হতাশার উচ্চারিত হয় বার্তায় তিনি তার সৈন্যবল ও যুদ্ধ উপকরণের ঘাটতির কথা বলেন। যদিও তিনি জানতেন এ পরিস্থিতিতে ঘাটতি পূবণ হবে না। কিন্তু ৬ ডিসেম্বরে যুদ্ধ পরিস্থিতি তেমন হতাশাব্যঞ্জক ছিল না। যেমনটা তিনি তার উর্ধ্বতনের কাছে প্রেরিত বার্তায় উল্লেখ করেন।

পাকিস্তানীরা প্রাথমিক পর্যায়ে সীমান্ত এলাকায় চমৎকার যুদ্ধ করে এবং মোটামুটিভাবে অক্ষত অবস্থায় পেছনের রক্ষামূলক দুর্গে পশ্চাদপসরণ করে। মূলত তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে পরাস্ত করার ভারতীয় প্রচেষ্টায় প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভারতীয় আক্রমণ রেখা প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলো পাশ কাটিয়ে যেতে সক্ষম হয় কিন্তু পেছন এলাকায় কোন মারাত্মক ধরনের হুমকি তারা সৃষ্টি করতে পারে না।

www.pathagar.com

প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখে সৈন্যরা যে বীরোচিত প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে সে জন্য ৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে জেনারেল নিয়াজির জন্য প্রশংসা বার্তা প্রেরণ করেন এবং ভূ-খণ্ড হারানোর বিনিময়ে রক্ষামূলক অবস্থান ধরে রাখতে উপদেশ দেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল নিয়াজিকে আশ্বাস দেন যে, চীন এবং আমেরিকান হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কাছাকাছি পর্যায়ে। সুতরাং তাদের হস্তক্ষেপ যাতে সম্ভব হয়ে ওঠে সে জন্য তাকে প্রতিরোধ ধরে রাখতে হবে। কিন্তু এ আশ্বাসের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না।

জেনারেল নিয়াজির সাথে মিলে গভর্নর ডাঃ মালিক ও পরিস্থিতির হতাশাব্যঞ্জক চিত্র আঁকেন– স্পষ্টতই জেনারেল নিয়াজির ব্রিফিং অনুযায়ী। ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহী তৎপরতায় সৃষ্ট বেসামরিক প্রশাসনের বিপর্যয়ের সত্যতাও তিনি স্বীকার করেন। তিনি রাওয়ালপিন্ডিকে এ বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, সরবরাহের বিচলন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছে। সাত দিনের ভেতর ঢাকা খাদ্য শূন্য হয়ে পড়বে। আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ গ্রামাঞ্চলের মানুষ মেনে চলছে। যে মুহূর্তে ভারতীয়রা পাকিস্তানী রক্ষাব্যূহ বিচূর্ণ করে ফেলবে সে মুহূর্তে অবাঙালি ও অনুগত পাকিস্তানীরা নির্বিচার হত্যার শিকার হবে। গভর্নর ট্রায় মালিক জোর দিয়ে বলেন, যদি কোন বিদেশী বন্ধু শক্ত কিছু করতে চায়, তাহলে তা শরীরী হস্তক্ষেপেই হতে হবে এবং সেটার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে।

আর সে সাহায্য যদি এ ধরনের না হয়, তাহলে সম্মানজনক শর্তে যুদ্ধ বিরতির জন্য খোলাখুলিভাবে সমঝোতায় বসার অনুমতি চাইলেন গভর্নর মালিক। তিনি জানান, এ পদক্ষেপ সহায়-সম্পদের অর্থহীন ধ্বংস ও জীবনহানি রোধ করবে। তার মতে, যে যুদ্ধের পরিণতি অনিবার্যভাবে স্পষ্ট, তা চালিয়ে যাওয়া একেবারেই অর্থহীন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যা করতে পারলেন, তা হল, গভর্নরকে পুনরায় আশ্বাস দেয়া। তিনি আশ্বাস দেন যে, বিশ্বশক্তিবর্গ জাতিসংঘে প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাশ হয়। ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তার অনুকূলে একটি প্রস্তাব পাশ করতে সক্ষম হয়। এর ফলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংখ্যাধিক্যের চাপে যুদ্ধরত দু'টো জাতির ওপর অতি সত্বর যুদ্ধ বিরতি চাপিয়ে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

এ আশঙ্কায় ভারতীয় বাহিনীকে যুদ্ধ শেষ হবার আগে সর্বোচ্চ বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই তীব্রতর করতে হয়। আরো অভ্যন্তরভাগে ভারতের প্রবেশে বাঁধা দেয়ার জন্য জেনারেল নিয়াজি একটা প্রচেষ্টা নিতে পারতেন। কিন্তু মনে হয়, তিনি পুরোপুরিভাবে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ৯ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফকে জানান যে, আকাশে ভারতীয় অধিপত্যের কারণে এবং স্থানীয় জনগণের চরম শত্রুতামূলক মনোভাবের দরুন সৈন্যদের পুনঃসংগঠিত ও রক্ষাব্যূহের পুনঃ বিন্যাসকরণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তিনি জোরের সাথে বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে ব্যাপকভাবে। ফলে রাতে বিচলন ঘটানো বিপজ্জনক। অবশ্য তিনি তার উর্ধ্বতনদের আশ্বাস দেন যে, তার সৈন্যরা প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং জাতীয় স্বার্থে লড়াই তারা চালিয়ে যাবে।

যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জেনারেল নিয়াজির হতাশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্তকে ভারতীয়রা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের হতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অবরুদ্ধ পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে জেনারেল মানেকশ'র একটি ব্যক্তিগত বার্তা বার বার প্রচার হতে থাকে। বিভিন্ন পাকিস্তানী রক্ষাব্যূহের ওপর একটি বার্তা সম্বলিত লিফলেট বিমান থেকে ফেলা শুরু হয়। বার্তায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের সম্বোধন করে বলা হয়, "সময় অতিক্রান্তির আগেই অস্ত্র ফেলে দিন।" বার্তায় হুশিয়ার করে দিয়ে বলা হয়: "ভারতীয় বাহিনী চারদিক থেকে আপনাদের ঘিরে ফেলেছে। আপনাদের বিমান বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা আপানাদের নেই। চট্টগ্রাম, চালনা এবং মংলা সমুদ্র বন্দর আটকে দেয়া হয়েছে। সমুদ্র পথে কেউই আপনাদের কাছে পৌছতে পারবে না। আপনাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। যে নির্দয়– নৃশংসতা আপনারা সংঘটিত করেছেন, তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুক্তিবাহিনী এবং জনগণ তৈরি হয়ে আছে। কেন জীবনহানি ঘটাবেন? আপনারা ঘরে ফিরতে চান না? সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হতে চান না? আর দেরী না করে আত্মসমর্পণ করুন। একজন সৈনিকের কাছে আপনার অস্ত্র সমর্পণের মধ্যে কোন গ্লানি নেই। আপনাদেরকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।" প্রতিরোধের নিষ্ফলতা প্রমাণের জন্য পাকিস্তানী রক্ষাব্যূহগুলোর ওপর বিমান আক্রমণ তীব্রতর করা হয়। বিশেষ করে ঢাকা শহরে প্রবেশ পথগুলো ২০ মাইলের মধ্যে এ আক্রমণ আরো প্রচণ্ড হয়।

www.pathagar.com

৯ ডিসেম্বর গভর্নর ডাক্তার মালিক পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ বন্ধের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি জাতিসংঘের প্রতি আশু যুদ্ধ বন্ধ এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করার আবেদন জানান। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সদস্যদের এবং পশ্চিম পাকিস্তানী বেসামরিক লোকজন, যারা পশ্চিমাঞ্চলে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে সম্মানের সাথে প্রত্যাবাসনের আহ্বান জানান তিনি। যারা ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করছে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিশোধের শিকার যাতে না হয়, তার গ্যারান্টি প্রদানেরও আহ্বান জানান।

প্রস্তাবটি অবশ্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অনুমোদন করেন নি। কারণ, তিনি অনুধাবন করেন যে, গভর্নর ডা ঃ মানিকের প্রস্তাবটিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে স্বীকারই করে নেয় হয়েছে। ইতোমধ্যে জেনারেল নিয়াজির বেসামরিক বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী গভর্নরের মৌন সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের প্রতিনিধি পল এম হেনরির কাছে পাঠিয়ে দেন।

প্রস্তাবটি সাথে সাথে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দৃষ্টিগোচরে আনা হয়। পরিষদ পাঁচ দফা পরিকল্পনা উপস্থাপনা করে। তাতে যুদ্ধ বিরতি, পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক লোকজনের উদ্ধার, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পর্যায়ক্রমে পাকিস্তানী বাহিনীর প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। প্রস্তারটিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সেভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স এবং ঢাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও নিউইয়র্কে চীনের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পরিষদের ধারাগুলো কার্যকর করবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সঙ্গে সঙ্গে ফরমান আলীর এই প্রস্তাব বাতিলের আদেশ জারি করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ জারি রাখার পাকিস্তানী বাহিনীর ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়েছে। তাদের প্রতিরোধের পতন আসন্ন। এই ইঙ্গিতকে একটি সফল সমর অভিযানে পরিণত করার লক্ষ্যে ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিনিধিরা এবং বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দেশগুলো নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্ককে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করেন। রাওয়ালপিন্ডিতে লন্ডন অবজারভার-এর সংবাদদাতা কলিন স্মীথ এ সময়কার মেজাজ সম্পর্কে লিখেছেন: "ইয়াহিয়া

www.pathagar.com

খান পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে সকল আশা ত্যাগ করেছেন। এখন তার কাছে একটাই মাত্র প্রশ্ন ঃ মুক্তাঞ্চল থেকে পাকিস্তানী বাহিনীকে ফিরিয়ে আনা এবং তা কীভাবে সম্ভব হবে?

এর পরও ইয়াহিয়া খান জেনারেল নিয়াজিকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দিতে থাকেন প্রেসিডেন্ট এবং "বড় কিছু" আক্রমণের প্রতিশ্রুতি দেন। বেতার তরঙ্গ বার্তা ইঙ্গিত দেয়, উত্তর এবং দক্ষিণের বন্ধুরা জেনারেল নিয়াজির সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সম্ভবত ইয়াহিয়া খানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যখন পূর্ব পাকিস্তানে তার অবস্থা অসহায় পর্যায়ের উপনীত হবে, তখন চীনের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে। তিনি এও জানতেন যে, মার্কিন সপ্তম নৌ-বহর বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জেনারেল নিয়াজি অবশ্য ইয়াহিয়া খানকে বিশ্বাস করেন নি এবং বাইরের সকল সাহায্যের আশা পরিত্যাগ করেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে একটি সফল আক্রমণ তার নিজের যুদ্ধকে হয়তো কিছু সময়ের জন্য বেগবান করতে পারে কিন্তু তাও হচ্ছে না।

নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের বন্ধুদের জন্য সুযোগ তৈরিতে কিংবা বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবমান বন্ধুর সুবিধার্থে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে জেনারেল নিয়াজি দ্রুত যুদ্ধ বিরতি লাভের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। নিজের সিদ্ধান্তের রাষ্ট্রনীতিক ও সামরিক তাৎপর্য বৃদ্ধির বিষয়টি তার চিন্তার উর্ধ্বে ছিল। সামরিক দিক দিয়ে তখনো তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন ঢাকা দুর্গে একটি সুসমন্বিত প্রত্যাহারের মাধ্যমে তিনি যুদ্ধকে আরো কয়েক সপ্তাহের জন্য ধরে রাখতে পারতেন।

সে অবস্থায় যুদ্ধে ভারতীয় গোলন্দাজ এবং সাঁজোয়া সহায়তাসহ চারটি দুর্বল ব্রিগেডের বেশি নিয়োগ করতে পারতো না। সরবরাহ সংক্রান্ত সহায়তাও পর্যাপ্ত পরিমাণে দেয়া সম্ভব হতো না। ঢাকা দুর্গকে মোকাবিলার জন্য কাঙ্ক্ষিত বাহিনী নির্মাণে কয়েকদিন লেগে যেতো। এ স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা রেখায় যদি জেনারেল নিয়াজি এক ডিভিশন কিংবা তারও বেশি লোক জড়ো করতে পারতেন তাহলে, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে পারতেন। কিন্তু মনের দিক দিয়ে জেনারেল নিয়াজি ভেঙ্গে পড়েন এবং যুদ্ধের ময়দানের তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যুদ্ধ পরিচালনা যুদ্ধরত স্থাপনাগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যুদ্ধচালিয়ে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলল। পাকিস্তানী প্রতিরোধ অবস্থানগুলো পাশ কাটিয়ে ভারতীয়রা উত্তর, উত্তর-পূর্ব, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব থেকে ঢাকার দিকে অগ্রপদক্ষেপে চমৎকার অগ্রগতি সাধন করে। ঢাকা এবং তার আশ-পাশ এলাকায় বিরামহীন বিমান আক্রমণে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পঙ্গু হয়ে পড়ে। লড়াইয়ের যুদ্ধের তাদের ভেতর কোন শৃঙ্খলা ছিল না। নির্দেশহীনতার মধ্যে সৈন্যরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

অথচ নিয়াজি বীরদর্পে বলতে থাকেন: "ঢাকা রক্ষার জন্য আমার হাতে যদি কোন বাহিনী না থাকে তাতেও কিছু আসে যায় না। এখন একটি মাত্র প্রশ্ন : বাঁচা এবং মরা এবং শেষ লোকটি নিয়েও আমরা যুদ্ধ করব।" কিন্তু ১৩ ডিসেম্বর তিনি একজন পরাজিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যান। একই দিনে তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে তার সর্বশেষ বার্তা প্রেরণ করেন, যা তার বিপন্ন অবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে এবং প্রেরণ করেন সম্ভবত যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত আলোচনা শুরু অনুমতির আশায়। রাওয়াল পিণ্ডি থেকে তাকে বলা হয়, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক চলছে এবং জাতিসংঘের উদ্যোগে যুদ্ধ বিরতি লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণ ভূ-খণ্ডের দখল আঁকড়ে বলা হয়। কিন্তু জেনারেল নিয়াজির অবস্থা ছিল সকল প্রেরণা সঞ্চারের উর্ধ্বে। ইতোমধ্যে ভারতীয়রা আসন্ন যুদ্ধ বিরতির আগেই ঢাকা দখলের চেষ্টায় অধিকতর গতি সঞ্চার করে। সময়ের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

১৪ ডিসেম্বর ঢাকা এবং রাওয়ালপিন্ডির মধ্যে বেতার বার্তার বিনিময় হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পায়। বার্তার ভাষায় আতঙ্কের আভাস স্পষ্ট। তাতে ঢাকা কর্তৃপক্ষের নৈতিক মনোবলে বিপর্যয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বেলা ১টার সময় প্রেরিত একটি বার্তায় বলা হয়, "আমরা আশার ওপর ভর করে বেঁচে আছি .... দয়া করে কিছুর নিশ্চয়তা দিন যা-ই ঘটুক, দ্রুত ঘটতে হবে।" স্পষ্টতই এ বার্তায় বাইরের সাহায্যের ইঙ্গিত দেয়া হয়। আর একটি বার্তায় বলা হয়, "আমাদের কোন মিসাইল নেই, কী দিয়ে বিমান হামলা ঠেকাব? বিমান বাহিনীও শেষ হয়ে গেছে। বিমান হামলা আমাদেরকে বিপন্ন করে তুলেছে"। কিছু পরে আরেকটি বার্তায় বলা হয়, "শুধু চট্টগ্রাম বাকি আর সবটাই হারিয়েছি। মনে হচ্ছে ঢাকাকে তারা ধ্বংস করবে যেমন সব কিছুই ধ্বংস করা হয়েছে। আমরা হেরে গেছি।" সবচেয়ে সেরা বার্তাটি ছিল "বেলা ১২ টায় আমরা গভর্নমেন্ট হাউজে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

একটি উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে জানতে পেরে ভারতীয় হাই কমান্ড বৈঠক ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট হাউজে বিমান হামলা চালাবার নির্দেশ দেন। যে পাইলটকে বিমান আক্রমণ পরিচালনার জন্য বাছাই করা হয়, তাকে একটি বিদেশি এয়ার লাইন্স থেকে সংগ্রহকৃত একটি টুরিস্ট ম্যাপ তড়িঘড়ি করে দেখিয়ে গভর্নমেন্ট হাউজের অবস্থান বুঝিয়ে দেয়া হয়। যে হল-ঘরে সভাটি চলছিল সেখানে একটি রকেট ফেলে যে পাইলট এবং এতেই বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে যায়। গভর্নর ডাঃ মালিক কাছাকাছি জায়গায় একটি বিমান আক্রমণ আশ্রয়ে ঢুকে পড়েন এবং একজনের কাছ থেকে একটি বলপয়েন্ট কলম ধার নিয়ে দ্রুত নিজের পদত্যাগপত্র লিখে ফেলেন। এরপর তিনি ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে নিজের সম্পর্কচ্যুতি ঘটান এবং রেডক্রস পতাকার ছত্রছায়ায় তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন। এখন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল নিয়াজির ওপর এসে পড়ে সব দায়িত্ব এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু জেনারেল নিয়াজি আগেই যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। ১২টি রাত তিনি ঘুমাননি এবং এ ভার তিনি আর টানতে পারছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান বাস্তবতাকে অনুধাবন করেন এবং একই দিন বিকেলে জেনারেল নিয়াজি ও গভর্ণরকে একটি বার্তা প্রেরণ করেন। তাতে বলেন: "প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আপনারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। জাতি আপনাদের জন্য গর্বিত এবং বিশ্ব আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান। সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য মানুষ্য ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু করা সম্ভব, তা আমি করেছি। আপনারা এখন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন যেখানে দাঁড়িয়ে মনুষ্য ক্ষমতার পক্ষে আর প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেটা অধিকতর জীবনহানি ঘটাবে এবং আরো ধ্বংস ডেকে আনবে। আপনারা এখন যুদ্ধ বন্ধের যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ সমস্ত বাহিনীর সদস্য, সকল পশ্চিম পাকিস্তান এবং অনুগত নাগরিকদের জীবনরক্ষার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইতোমধ্যে আমি জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি যাতে সে ভারতকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্ধের জন্য আহ্বান জানায় এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা, অন্যান্য– যারা দুস্কৃতকারীদের লক্ষ্য; তাদের জীবনরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছি।"

www.pathagar.com

যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করার জন্য নিয়াজি জেনারেল ঢাকার আমেরিকান কন্সাল জেনারেলের অফিসে যান। তিনি মোটামুটি চারটি শর্তের ভিত্তিতে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পেশ করেন। শর্তগুলো হলো : পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মনোনীত এলাকায় পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর একত্রীকরণের সুযোগ প্রদান, ১৮৪৭ সাল থেকে যারা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করছে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং ১৯৭১ সালের মার্চ হতে প্রশাসনকে যারা সহযোগিতা দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করা না হয়, তার নিশ্চিয়তা প্রদান। সর্বশেষে তিনি এ আশ্বাস দেন, জাতিসংঘ যে সিদ্ধান্ত নেবে তা তিনি মেনে চলবেন। এ বার্তাটি কন্সাল জেনারেল বেতার মারফত দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন এবং সাথে সাথে সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয়রা অবশ্য তখন জানিয়ে দেয় যে শর্তহীন আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫ ডিসেম্বর গভর্নর ডাঃ মালিক এবং মেজর জেনারেল ফরমান আলী জাতিসংঘ সচিবালয়কে জানান, পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রস্তুত কিন্তু আসন্ন যুদ্ধ বিরতির শর্ত আলোচনার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এ বার্তাটিও ভারতীয়রা তাদের বেতার যন্ত্রে ধরে ফেলে এবং জেনারেল নিয়াজি বা অন্য কেউ মত পরিবর্তনের সময় যাতে না পায় তার আগেই নিয়াজির সদর দফতরের ওপর বিমান থেকে বোমা বর্ষণ তীব্রতর করা হয়। একই দিন সন্ধ্যায় অল ইন্ডিয়া রেডিও জেনারেল নিয়াজির জন্য জেনারেল মানেকশ'র একটি বার্তা কিছু সময় পর পর প্রচার করতে থাকে। জেনারেল নিয়াজির বেতার বার্তা উল্লেখ করে মানেকশ'র বার্তায় বলা হয়: "যেহেতু যুদ্ধ বন্ধের ইঙ্গিত দিয়েছেন আমি আশা করি বাংলাদেশে আপনার কমান্ডের অধীনে সকল বাহিনকে যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দেবেন এবং যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, আমার অগ্রসরমান বাহিনীর কাছে তাদেরকে আত্মসর্পণ করতে বললেন।" জেনারেল মানেকশ এ আশ্বাস দেন যে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা –যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদেরকে জেনেভা কনভেশন অনুযায়ী সৈনিকের সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হবে। আহত ও অসুস্থদের যত্ন নেয়া হবে এবং মৃতদের মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করা হবে।

জেনারেল মানেকশ তার বার্তায় আরো বলেন: "নিরাপত্তার ব্যাপারে কারো উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই– যেখান থেকেই তিনি আসুন না কেন। আমার অধীনস্থ সৈন্যদের প্রতিশোধ নেয়ার কোন ব্যাপারও নেই।" তিনি

www.pathagar.com

আরো জানান, যে মুহূর্তে তিনি ইতিবাচক সাড়া পাবেন, তখনই তিনি জেনারেল আরোরাকে আকাশ এবং ভূমিতে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সকল অপারেশন বন্ধের নির্দেশ দেবেন। নিজের সদিচ্ছার নমুনা প্রদর্শনের জন্য জেনারেল মানেকশ ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা থেকে পরদিন ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯ টা পর্যন্ত ঢাকা এবং আশ-পাশ এলাকার ওপর বিমান হামলা বন্ধের নির্দেশ দেন এবং এরপর তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন : যদি আপনি আমার কথা মেনে না নেন, সেক্ষেত্রে আমার জন্য বিকল্প কিছু রাখছেন না। বরং ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে আমাকে পুরো শক্তিতে পুনরায় আক্রমণ শুরু করতে হবে।"

জেনারেল মানেকশ'র বার্তার জবাবে জেনারেল নিয়াজির বক্তব্য শোনার জন্য সকল রেডিও সংযোগকে সক্রিয় রাখা হয়। কিন্তু রাত কেটে যায় কোন সাড়া আসে না। জেনারেল মানেকশ অস্থির হয়ে ওঠেন। কেননা, জবাবের জন্য অপেক্ষাকে অনন্ত অপেক্ষা বলে মনে হতে থাকে। রাত কেটে সকাল আসে তথাপি জবাব আসে না। ১৬ ডিসেম্বর সকাল আটটায় জেনারেল মানেকশ যখন দিনে বিমান হামলা শুরু করার নির্দেশ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক তখনই হঠাৎ করেই বেতার সংযোগ সক্রিয় হয়ে ওঠে। বেতারবার্তা জেনারেল নিয়াজির অনুরোধের কথা জানায়। তাতে নিয়াজি যুদ্ধ স্থগিতের সময়সীমা আরো ৬ ঘন্টা বাড়াতে অনুরোধ করেন এবং আত্মসমর্পণের শর্তাবলী আলোচনার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন প্রতিনিধিকে ঢাকায় পাঠাতে বলেন। সময়-সীমা বাড়ানোর অনুরোধ মঞ্জুর করা হয় এবং এবার পদাতিক বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পর মেজর জেনারেল নাগরা তার ব্রিগেড কমান্ডারদের সঙ্গে নিয়ে নিয়াজির সদর দফতরে গেলেন।

১৬ ডিসেম্বর সকালে জেনারেল নিয়াজি তার সকল স্থাপনাকে যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দেন। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তারা যে নির্ভীকতা এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তার প্রশংসা করে তিনি বলেন, এমন একটি পর্যায়ে তারা উপনীত হয়েছেন, যেখানে দাঁড়িয়ে আর প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন বলে প্রমাণিত হবে এবং যার পরিসমাপ্তি ঘটবে অযথা জীবনহানির ভেতর দিয়ে। তিনি তাদেরকে নির্দিষ্ট এলকায় জামায়েত হবার আদেশ দেন। নির্দেশ দেন আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। দেখা গেল, হয় তার বার্তা

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে নি অথবা স্থানীয় কমান্ডাররা স্বেচ্ছাকৃতভাবে তার আদেশকে উপেক্ষা করেছে। কেননা, আত্মসম্পর্ন অনুষ্ঠানকালে খুলনা, রাজশাহী, নাটোর, দিনাজপুর, রংপুর, প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল। আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পর অধিকাংশ কমান্ডাররা বিপর্যয়ের জন্য জেনারেল নিয়াজিকে দায়ি করেন এবং বলেন, তাদেরকে অর্থহীনভাবে অমর্যাদাকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সর্বমোট ১৬০৬ জন অফিসার, ২৩৪৫ জন জুনিয়র কমিশনড অফিসার, অন্যান্য স্তরের ৫৪,১০৯ জন এবং নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত অথচ যোদ্ধা নয়– এমন ১০১১ জন, আধা-সামরিক বাহিনীর ৭১ জন অফিসার, ৪৪৮ জন জুনিয়র কমিশনড অফিসার এবং অন্যান্য স্তরের ১১,৬৬৫ জন পাকিস্তান নৌ–বাহিনীর ৯১ জন অফিসার, ৩০ জন পেটি অফিসার এবং অন্যান্য স্তরের ১২৯২ জন, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ৬১ জন অফিসার, ৩১ জন ওয়রেন্ট অফিসার ও ১০৪৯ জন এয়ারম্যান, পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পদের ১৬৬ জন এবং ৭,৫৫৫ জন বেসামরিক লোক বিভিন্ন গ্যারিসনে আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধে ভারতীয়দের পক্ষে জীবনহানি ঘটে ১৪২১ জনের। এর মধ্যে অফিসারের সংখ্যা ৬৮, জুনিয়র কমিশনড অফিসার ৬০ জন এবং অন্যান্য স্তরের ১,২৯৩ জন। আহত হয় ৩০৬১ জন। এর মধ্যে অফিসার ২১১ জন, ১৬০ জন জুনিয়র কমিশনড অফিসার এবং অন্যান্য স্তরের ৩৬৯০ জন। যুদ্ধে ভারতীয়দের পক্ষে নিখোঁজের সংখ্যা ৫৬।

আত্মসমর্পণ নাটকের উত্তেজনা ও বিভ্রান্তির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিবহণ বিমান স্কোয়াড্রন, যা গঠিত ছিল আটটি হেলিকপ্টর নিয়ে (চারটি এম, আই-৮ এ এবং চারটি অ্যালাউট) এবং যার অধিনায়কত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল লিয়াকত বোখারি তিনি উচ্চ পদস্থ আহত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারবর্গদের নিয়ে হেলিকপ্টারে করে ১৫ ডিসেম্বর রাতে বার্মার আকিয়াবে উড়ে যান। সেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে। এদের ভেতর ছিলেন মেজর জেনারেল রহিম খান।

নিজের কমান্ডের ওপর নিয়াজির কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আত্মসমর্পণকালে তার সদর দফতর তার বাহিনীর সঠিক সংখ্যার হিসাব দিতে অসমর্থ হয় এবং কোথায় তারা অবস্থান করছে, তাও জানাতে পারে না। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বিভিন্ন স্থানে গুদামজাত হয়ে পড়েছিল এবং তা বিজয়ীদের হাতে এসে যায়। নিয়াজির অধীনের যত সৈন্য

www.pathagar.com

ছিল, যুদ্ধ-উপকরণ যে পরিমাণ মজুদ ছিল এবং বিশাল বিশাল নদী ও অসংখ্য জলা তার যুদ্ধ ক্ষমতাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, তাতে তার যদি লড়াই করার স্পৃহা থাকত, তবে তিনি লড়াই দীর্ঘায়িত করতে পারতেন এবং পাকিস্তানের বৈদেশিক বন্ধুরা নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে আঞ্চলিক অখণ্ডতার পক্ষে যতোক্ষণ না কোন রক্ষাকবচ লাভ করছে এবং ভারতকে তা গ্রহণে বাধ্য করছে ততক্ষণ পর্যন্ত জেনারেল নিয়াজি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতেন।

বাংলাদেশের জলসীমায় নিজস্ব নৌ-বাহিনীর টাস্ক ফোর্সকে প্রবেশের আদেশ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রান্তে চলে আসে। এ বাহিনীর প্রধান জাহাজটি ৯০ হাজার টনি 'এন্টারপ্রাইজ' পারমাণবিক শক্তি চালিত বিমানবাহী জাহাজ। পরমাণু যুদ্ধাস্ত্রবাহী ফ্রান্টম জঙ্গী ও বোমারু বিমান বহন করছে এ জাহাজটি। আরেকাটি বিমানবাহী জাহাজ ত্রিপোলিও সাথে ছিল। এটি কমান্ডো হেলিকপ্টারবাহী জাহাজ। এছাড়া ছিল আরো ৬টি জাহাজ। এর মধ্যে ছিল ডেস্ট্রয়ার ও রক্ষী জাহাজ। কয়েকটি ছিল মেরিন সৈন্য ও প্রশাসনিক লোকবাহী জাহাজ।

এ টাস্ক ফোর্সের ঘোষিত কাজ ছিল স্বল্প সংখ্যক মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধার করা। কিন্তু নয়াদিল্লী অনুধাবন করে যে, এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি পরাশক্তির পেশী প্রদর্শনীর মহড়া। কিন্তু ভারত সরকার এবং ভারতীয় সামরিক হাই কমান্ড এ পেশী প্রদর্শনীর কাছে নতিস্বীকার করে না। এর পরিবর্তে ঢাকায় আত্মসমর্পণে অগ্রগতি সাধনে অধিকতর গতিবেগ সঞ্চারে চাপ প্রয়োগ করে। ওয়াশিংটনের সংবাদপত্র কলামিস্ট জ্যাক এন্ডারসন পরে প্রকাশ করেন যে, মার্কিন বাহিনীর ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা হয়; "পূর্ব পাকিস্তানের জলসীমায় ভারতীয় অবরোধকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে টাস্ক ফোর্স ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ ও যুদ্ধ ভিমানকে ভিন্নমুখি করাবে তাকে অনুসরণে বাধ্য করে। এতে পাকিস্তানী পদাতিক সৈন্যদের ওপর ভারতীয় অপারেশণের চাপ বসে যাবে।"

টাস্ক ফোর্স দেরিতে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করার কারণে তাদের হয়ে দায়িত্ব পালন তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

www.pathagar.com

বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনাবলি

ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে আগুন

পূর্বাঞ্চল সেক্টরে, ময়নামতি পাহাড়, প্রস্ফুটিত কৃষ্ণচূড়ার আগুনে, ষড়যন্ত্রের উর্বর মাটিতে রূপান্তর ঘটে। বাংলাদেশে অন্যান্য পাকিস্তানী গ্যারিসনসমূহের তুলনায় কুমিল্লা গ্যারিসনই সবচে' মারাত্মক এক হত্যাকারীর প্রভাবে থেকে যায়। উক্ত হত্যাকারীর নাম মেজর সুলতান, ৫৩ তম ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ হত্যা করার ক্ষেত্রে তার জুড়ি নেই। সে একটি নীল নক্সা তৈরি করে যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সকল শ্রেণীর বাঙালি সৈনিকদের নাম। এ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

১৯৭১ -এর জানুয়ারি থেকে মেজর খালেদ মোশাররফ-এর পাকিস্তানী এবং বাঙালিদের মধ্যে বিরাজমান অবিশ্বাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল। ৫৭তম ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজররূপে তিনি উপলব্ধি করতেন যে, ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব খান তাকে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন ব্রিগেটটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে ঢাকা নগরীতে অবস্থান করছিলো তখন পশ্চিম পাকিস্তানী কমান্ডারদের দৃষ্টিতে ব্রিগেড মেজর হিসেবে তিনি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। ঐ সময় তিনি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের পদে বদলি হন। কমান্ডার ছিলেন লেঃ কর্নেল খিজির হায়াত। ২২তম মার্চ সন্ধ্যায় তিনি কুমিল্লা পৌছেন এবং পরদিন তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কুমিল্লা হত্যাকাণ্ডের নীলনক্সা আগেই তৈরি ছিল ৫৩তম ফিল্ড রেজিমেন্টের গোলন্দাজ কামান ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের অবস্থানের দিকে তাক করা হয়। ৩য় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির করে। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অস্ত্র সমর্পণের ব্যাপারে অসম্মত হলে কী করা হবে এর ব্যবস্থা আগেই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে পাকিস্তানী যুদ্ধকৌশলে একটি পরিবর্তন ঘটে। ২৬ মার্চ ৫৩তম ব্রিগেডের একটি বিশেষ অংশ ৮৮তম মর্টার ব্যাটারী এবং ২৪তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্সসহ স্বয়ং ব্রিগেড কমান্ডারের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হয়। এর ফলে গ্যারিসন প্রতিরক্ষার প্রশ্নে অযৌক্তিক অবস্থানে থেকে যাবে যদি ৪র্থ

www.pathagar.com

ইস্ট বেঙ্গলকে ময়নামতি ফেলে যাওয়া হয়। কেননা, এর দলত্যাগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি অবস্থার কারণে তেমন কিছু ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মার্চ মাসের প্রথম দিকে ব্যাটালিয়নের চার্লি এবং ডেল্টা কোম্পানীকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পেরণ করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী কোম্পানী কমান্ডার মেজর সাদেক নওয়াজ ডেল্টা কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন। তাছাড়া, সেখানকার সকল সৈনিকের কমান্ডেও তাকে নিয়োজিত করা হয়। মেজর শাফায়াত জামিল, একজন বাঙ্গালি অফিসার, চালিং কোম্পানী কমান্ড করেন। তার সামরিক তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত অন্যতম এলাকা হচ্ছে শাহবাজপুর।

২৪ মার্চ খালেদ মোশাররফকে আলফা কোম্পানীসহ শমসেরনগরে অগ্রসর হওয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়। আর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার-এর ভাষায় যা ছিল "ভারতীয় অনুপ্রবেশ' তা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব দেয়া হলো মেজর খালেদ মোশাররফকে। সাধারণত সেকেন্ড-ইন-কমান্ড কোম্পানী কমান্ডারের ভূমিকায় আসেন না। এটি হচ্ছে অধঃস্তন অফিসারের দায়িত্ব। তৎপরতা চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে দু'টি বা তিনটি কোম্পানী ব্যাটালিয়ন থেকে আলাদা করে সেকেন্ড-ইন- কমান্ডকে দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে। অবশ্য, ব্রিগেড কমান্ডার তার কাছে শিগগিরই আরো সৈন্য প্রেরণের আশ্বাস দেন। মেজর খালেদ মোশাররফকে বলা হয়, ৩১তম পাঞ্জাব সিলেট থেকে এক কোম্পানী এবং ইপিআর থেকে দু' কোম্পানী শমসেরনগরে মেজর খালেদের কাছে পাঠানো হবে। পরবর্তী সময়ে জানা গেছে যে, উক্ত তিনটি কোম্পানীর সৈনিকদের বিচ্ছিন্ন আক্রমণে ৩১তম পাঞ্জাব কর্তৃক হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল।

২৪ মার্চ আলফা কোম্পানী গন্তব্যস্থলে পৌঁছে। কুমিল্লা থেকে একশ' মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত শমসেরনগর এলামেলোভাবে গড়ে ওঠা বিশাল বিস্তৃত চা বাগান, সত্যিকার অর্থেই একটি নির্জন এলাকা।

খালেদ মোশারফ ভাবতে শুরু করেন। কোনো কিছু করার আগে তাকে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বেতার মারফত তিনি মেজর শাফায়াতের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। মেজর সাদেক নওয়াজ মেজর শাফায়াতকে ছায়ার মত অনুসরণ করছিল। ঢাকার কাছাকাছি থাকার কারণে মেজর শাফায়াত জানতে পারে ঢাকায় কী ভায়াবহ অবস্থা ঘটছে। পালিয়ে আসা ভয়ার্ত ব্যক্তিদের দেখে সে মর্মাহত হয়। অস্থির অশান্ত এবং উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

ব্রাভো কোম্পানীর (৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের) সদর দপ্তর কুমিল্লায়। লেফটেন্যান্ট গাফফার, বাংলাদেশের একজন তরুণ এবং বিচক্ষণ সন্তান হচ্ছেন এর এডজুটেন্ট। সে বিজ্ঞতার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানী কমান্ডিং অফিসারকে হাতে রাখতে সমর্থ হয়। লেফটেন্যান্ট গাফফার পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছে– "লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত তেমন জঠিল ছিলেন না। সুকৌশলে তাকে আয়ত্ত করা যেত।" লেফটেন্যান্ট গাফফার তাকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে, অবশিষ্ট সৈনিকদের নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়া উচিত।

২২ মার্চ থেকে "যুদ্ধ নয়, শান্তি" ধরনের অবস্থান কুমিল্লা সেনানিবাসে বিরাজ করে। ৩য় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহিদ খানের কমান্ডে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল-এর সাথে মোকাবেলা করার জন্যে মেশিনগানসমূহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপর তাক করে রাখে। এ দৃশ্য লেফটেন্যান্ট গাফফার সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করে চলে। সে গোপনে তার লোকদের একই ধরনের অস্ত্র দেয় এবং পশ্চাদপসরণের মুহূর্তে সংকেতধ্বনি করার ব্যবস্থা করে। ২৫ মার্চ পর্যন্ত ব্যাটালিয়নটি সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত থাকে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেজর শাফায়াতও আসন্ন ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে যায়। তার ব্যাটালিয়ন অতি সম্প্রতি ব্রিটিশ প্যাটার্নের অস্ত্র থেকে চীনা অস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে। ব্রিটিশ অস্ত্রসম্ভার এখনো ব্যাটালিয়ন সদর দফতরে রয়ে গেছে। এসব বিষয় তার জানা রয়েছে। অতএব, সে তার কোয়াটার মাস্টার-এর সাথে ব্যবস্থা করে গোপনে সেসব অস্ত্র রেশন বহনকারী যানবাহনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে। ২৫ মার্চের মধ্যে ব্রিটিশ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় পুরো সম্ভারই চাল এবং আটার ব্যাগের মধ্যে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠিয়ে দেয়া হয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত অবশিষ্ট সেনাদল নিয়ে ব্যাটালিয়ন সদর দফতরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্থানান্তর করার ব্যাপারে ব্রিগেড কমান্ডারে সাথে আলোচনা করেন। ব্রিগেড কমান্ডারের শুভাশিসসহ ২৪ মার্চ রাতে তার ব্যাটালিয়নের বাকি অংশ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেন। পরিবারবর্গ ময়নামতি সেনানিবাসে রয়ে যায়। ক্যাপ্টেন মতিনও জাঙ্গালিয়ায় এক প্লাটুন রেখে তার ব্র্যাভো কোম্পানী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপস্থিত হয়।

এখন প্রধান বিষয় হল মেজর খালেদের সাথে যোগাযোগ করা। লেফটেন্যান্ট গাফফার ঐদিন সন্ধ্যায় কোন এক সুযোগে বেতারের মাধ্যমে মেজর খালেদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে। লেফটেন্যান্ট গাফফারের কাছে

www.pathagar.com

এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা চলছে। সময় নষ্ট না করে সে যেন নিজের কোম্পানীসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে আসে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত ব্যাটালিয়নের উদ্দেশে ভাষণ দিতে চান। ২৭ মার্চ ভোরবেলা প্যারেড গ্রাউন্ডে ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের ভাষণ শোনার জন্যে সৈন্যরা সমবেত হয়। কিন্তু এ ভাষণের আগে ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের একটি অফিস তাঁবুতে নির্ধারিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। মেজর শাফায়াত তার লোকজন নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্যে তৈরি থাকে। সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার পরে মেজর শাফায়াত হঠাৎ করে একটি সাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে- নাটকীয়ভাবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াতসহ আলোচনা টেবিল থেকে আরো দু'জন পাকিস্তানী সৈন্যকে গ্রেফতার করে। অবশিষ্ট ৩৬ জন পাকিস্তানী সৈন্যকেও একইভাবে গ্রেফতার করা হয়। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট –বেবী টাইগার বা শিশু শার্দূল বলে পরিচিত–একটি অসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করে। মেজর শাফায়াত দ্রুততার সাথে তার সৈন্যদের মোতায়েন করে মেজর খালেদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

বেলা ১১ টায় মেজর খালেদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছে ব্যাটালিয়নের কমান্ড গ্রহণ করে। ইপিআর, পুলিস এবং স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যাটালিয়ন এলাকায় সমবেত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে তাদের কাজ করে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে। মেজর খালেদ বিভিন্ন ধরনের উপাদানসমূহ সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এ সময়ে কুমিল্লা থেকে পালিয়ে ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিন এসে ব্যাটালিয়নের সাথে যুক্ত হয়। তাকে সাবেক ডেল্টা কোম্পানীসহ ইপিআর, পুলিস এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মেজর খালেদ বিস্তৃত এলাকা নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করেন। চার্লি কোম্পানীর এক প্লাটুনসহ লেফটেন্যান্ট গাফফারকে গোকনঘাটে প্রেরণ করা হয়। এন্ডারসন খাল এলাকার ডেল্টা কোম্পানীর অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে আখাউড়া- গঙ্গাসাগর-কসবা রক্ষাব্যূহের জটিল দায়িত্বে প্রেরণ করা হয় মেজর শাফায়াত জামিলকে। মাধবপুর সদর দফতরে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয় ব্র্যাভো কোম্পানীকে।

৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সদর দফতর তেলিয়াপাড়া চা বাগানে সরে যায়। সেখানে ব্যাটালিয়ন-এর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় আরো বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব সিলেট পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়।

www.pathagar.com

অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া

মানুষের জীবনে এমন সব মুহূর্তও আসে যখন সে তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কৌশলসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে বিধাতার ইচ্ছার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে। বিধাতা তখন তার স্বর্গীয় দীপ্তির সাহচর্যে নিঃশেষিত মানুষটাকে নিয়তির নিরাপদ আশ্রয়ে চালিত করেন। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামানের ভাগ্যে তাই ঘটেছে। সে ৫৩তম ফিল্ড রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজো অতীতের ভয়াবহ মুহূর্তের কথা স্মরণ করে বিচলিত বোধ করে বলেন "সেটি হচ্ছে এক অলৌকিক ব্যাপার যা আমাকে পেয়ে বসেছিল এবং আমাকে তাবৎ বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল।"

নূরুল ইসলাম এবং এ. এল. এ. জামান হচ্ছে রেজিমেন্টের দু'জন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন সাদিক বাংলাদেশে অবস্থানকারী উর্দু ভাষাভাষী অবাঙালি এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান বাঙালিদের মধ্যে সবচে' তরুণ বয়সী তাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াকুব মালিক কুমিল্লায় সংঘটিত অনুভূতিহীন নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রধান হোতা এবং এ কাজে তার সহযোগী হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্রিগেড কমান্ডার মেজর সুলতান।

পারস্পারিক অবিশ্বাসের মাত্রা তুঙ্গে উঠে গেছে। চূড়ান্ত আঘাতের প্রস্তুতি পর্যায়ক্রমে শেষ হয়ে আসছে। ২৫ মার্চ লেফটেন্যান্ট ইমামের ইউনিট শিথিল অংশের প্রান্তরেখাগুলো একই সুতোয় গ্রথিত করার চেষ্টা করে।

সন্ধ্যার কিছু আগে কমান্ডিং অফিসার তাকে অনির্ধারিত নৈশ দায়িত্ব পালনের জন্যে ডেকে পাঠায়। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। লেফটেন্যান্ট ইমাম দ্রুত সামরিক পোশাক পরিধান করে দপ্তরে চলে যায়। সেখানে অফিসারদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট ইমাম, ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম, ক্যাপ্টন জামান এবং ক্যাপ্টেন সিদ্দিক সবাই উপস্থিত রয়েছে। অস্বাভাবিক রাত্রিকালীন দায়িত্ব তাদের মুখের ওপরে বিষাদের ছায়া ফেলেছে। ক্লাবে বৃহস্পতিবারে নিয়মিত তাম্বুলা খেলা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ঢেকে রাখতে পারে নি।

www.pathagar.com

ইউনিটের এডজুটেন্ট সবাইকে জানিয়ে দেয় যে ঘন্টাখানেকের জন্যে প্যারেড স্থগিত রাখা হয়েছে। সে লেফটেন্যান্ট ইমামের কাছে গিয়ে বলে– "চলুন একটু তাম্বুলা খেলা যাক।"

লেফটেন্যান্ট ইমাম অসম্মত হয়। কিন্তু শেষাবধি রাজি হতে হল। ক্লাব বিসদৃশ অবস্থা ধারণ করে রয়েছে। বাঙালি অফিসারদের সবাই উপস্থিত। উপস্থিত রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আনোয়ার, এবং অন্যান্য। ব্রিগেড কমান্ডার কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারসহ সেখানে তাম্বুলায় যোগ দিতে এসেছেন। তাম্বুলা শুরু হল।

খেলা চলাকালে টেলিফোন বেজে ওঠে। মদ্য পরিবেশক ছুটে ব্রিগেড কমান্ডারকে বলে– "স্যার, কোর কমান্ডার টেলিফোন লাইনে রয়েছেন।"

ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি টেলিফোন নিয়ে বললেন–"স্যার, সব কিছু প্রস্তুত। চিন্তার কোন কারণ নেই। পরিকল্পনামত সব কিছু চলছে।" কথোপকথন দ্রুত শেষ হয়।

লেফটেন্যান্ট ইমামের মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে যেনো ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। ব্রিগেডিয়ারের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে এডজুটেন্ট লেফটেন্যান্ট ইমামসহ অন্যদের বলে–"সবাই অফিসে ফিরে চলুন।

অতঃপর ৪ জন বাঙালি অফিসারকে সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের সাথে বসার জন্যে বলা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার, জেসিও এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য অতর্কিতে তাদের ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। প্রত্যেকের মুখ গম্ভীর। ওরা প্রত্যেকেই দ্রুত পদচারণা শুরু করে যেন সহসা কোন কিছু ঘটে গেছে। কমান্ডিং অফিসার চারজন বাঙালি অফিসারকে ডেকে পাঠান। ভীতসন্ত্রস্ত এবং কম্পিত অফিসাররা লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াকুবের সামনে দাঁড়ান। ওদের চোখের দিকে না তাকিয়ে কমান্ডিং অফিসার মৃদু কণ্ঠে বলে–"এই মাত্র ভুট্টো এবং মুজিব গ্রেফতার হয়েছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় এলাকায় কার্ফু চলছে। সৈন্যরা শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পথের মধ্যে বাঙালিদের যাকে পাবে তাকেই হত্যা করবে। নিজেদের লোকজনকে হত্যা করা অপ্রিয় ব্যাপার হবে। তাই, অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্যে তোমরা ৪জন অফিস ভবনেই অবস্থান করবে। তোমাদের বিছানা এবং খাবার নিয়ে আসা হচ্ছে। অন্য কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ করা হল।"

www.pathagar.com

কথাগুলো বলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াকুব চুপ হয়ে যান। ক্যাপ্টেন সিদ্দিক প্রশ্ন করেন– "আমি বিহারী, আমি কোথায় থাকব?" কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে লেঃ কর্নেল ইয়াকুব জবাব দেন– "তুমিও এখানে থাকবে।"

এডজুটেন্ট তাদেরকে কোয়াটার মাস্টারের দপ্তরে নিয়ে যায়। সেখানে ৪টি খাটিয়া পাতা রয়েছে। দরজা ও জানালার পাশে সান্ত্রী দাঁড়িয়ে। অফিস ভবনের চার দেয়ালের ভেতরে ওরা আবদ্ধ। বাথরুম এবং টয়লেটে যাবার সময় বারান্দা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়।

কামান-বন্দুকের শব্দ এবং সৈনিকদের দেখা ছাড়া চারজন বন্দী বাইরের বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। পরের দিন সকাল বেলা সম্ভাব্য বিপদের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সতর্ক প্রহরায় একটি কালো রঙের গাড়ি অফিসের সামনে এসে থামে।

গাড়ি থেকে যারা নেমে আসেন তাদের মধ্যে রয়েছে কুমিল্লার ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিস সুপার। দু'জনকে গাদাগাদি করে অফিস ভবনের বাথরুমের কাছে একটি কক্ষে আটক রাখা হয়। নিকটবর্তী ভবনসমূহে ট্রাকভর্তি অসামরিক ব্যক্তিদের ধপ করে নামিয়ে দেয়া হয়। অবস্থার কোন শেষ নেই। অন্ত নেই। এবং তা করতে গিয়ে প্রকাশ্যে লোমহর্ষক বর্বর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। মৃত্যুযাতনায় নিপীড়িত ব্যক্তিরা যন্ত্রণায় বুক-ফাটা আর্তনাদে গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তাদের মৃতদেহ বাইরে টেনে নিয়ে স্তূপাকারে রেখে দিয়ে দ্রুত গণকবরে ফেলে মাটিচাপা দেয়া হয়।

বর্ণিত চার বাঙালি অফিসার নীরবে নিঃশব্দে মানুষ হত্যার নির্মম কাহিনী প্রত্যক্ষ করে, অসহায়ভাবে নিজেদের পরিণতির কথাও ভাবতে থাকেন। উর্দু ভাষী ক্যাপ্টেন সিদ্দিককে বিশ্বাস করা যায় নি। সে বারংবার বলতে থাকে– পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। ওরা মেরে ফেলবে। এখানে আমরা নিরাপদ।

ঐদিন ক্যাপ্টেন এ. এল. এ. জামান এডজুটেন্টকে মিনতি করে বলতে থাকেন– আমি কমান্ডিং অফিসারের সাথে কথা বলতে চাই। শেষ পর্যন্ত কমান্ডিং অফিসারকে অবহিত করা হলে তিনি যাবার পথে দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন– জামান, তুমি কি চাও?

www.pathagar.com

জামান এগিয়ে এসে বলে– "স্যার, আমি আপনার বেশ কাজে লাগতে পারি। শহরের লোকজনদের আমি চিনি। আমি আওয়ামীলীগ নেতাদেরসহ দুষ্কৃতকারীদের চিনি। তাদের গোপন আবাসস্থল থেকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসব। আমার অনুগত্য প্রকাশের সুযোগ দিন।"

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াকুব আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং বলে– "ঠিক আছে।" এডজুটেন্টের দিকে তাকিয়ে বলে– "তাকে অস্ত্র দেয়ার ব্যবস্থা কর। ক্যাপ্টেন জামান মুক্ত মানুষের মতো বেরিয়ে যায়। তার গর্বিত মুখায়বে এক ঝলক আনন্দের রেখা। অবশিষ্ট তিন বন্দী নিঃশব্দে তাকায়। এ হচ্ছে ২৬ শে মার্চের ঘটনা।

এভাবে ক্যাপ্টেন জামান পাকিস্তানীদের আস্থা অর্জন করে। নিজের লুটতরাজ এবং সহিংসতা নিয়ে সে উচ্চকিত। প্রায়ই অফিস ভবনের কাছে এসে উর্দু ভাষায় সে বলেঃ ইয়ার! দ্যাখো কিত্না মিসক্রিয়েন্ট লে আয়া! ইন্কো জলদি দফা কর। মেয় দু'বারা শহর যাতা হো।

এডজুটেন্ট ছুটে গিয়ে যানবাহন খালি করে। ক্যাপ্টেন জামান পাকিস্তানের প্রতি তার আনুগত্য পুনর্বার প্রমাণ করার জন্যে কাজে লেগে যায়।

মার্চ থেকে বন্দীদের চোখে ঘুম নেই। সামান্য যা কিছু খাবার দেয়া হয় তাই তারা খেয়ে নেন। লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম সতর্কতার সাথে কথা বলে। অবাঙালি ক্যাপ্টেন সিদ্দিকের উপস্থিতি পালিয়ে যাবার ব্যাপারে তাদেরকে নিরস্ত্র করে। প্রহরীরা দরজা এবং জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। অদূরে লাইট মেশিনগান নিয়ে আরেকজন সতর্ক প্রহরী। লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান আজো ভুলে যায় নি ঐসব দুঃসহ মুহূর্তের কথা। ইমাম বলেন, 'পালানোর পথ নেই। ২৮ মার্চ থেকে আমাদের প্রকোষ্ঠ সারারাত আলোকিত থাকে। প্রহরীদের জাগ্রত দৃষ্টি আমাদের ওপরে। পলায়ন একেবারেই অসম্ভব ছিল।

২৯ মার্চ ঘটনা মোড় নেয়। সন্ধ্যার আগে রেজিমেন্টের ১৮টি ফিল্ড গান একই সময়ে গর্জে ওঠে। চারদিকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। একই সময়ে সেনানিবাসের দূরবর্তী এলাকা থেকেও মেশিগানের স্বয়ংক্রিয় গুলীবর্ষণ চলতে থাকে। চারদিকে বিচ্ছিন্ন গোলাগুলী। বন্দীগণ ভয় পেয়ে যান। কী ঘটে চলেছে তারা জানতেন না। তবে অনুমান করেন– হয়তো ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল কুমিল্লা সেনানিবাস আক্রমণ করেছে। কিন্তু তারপর? তারপর কী হবে! তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

ব্রিগেড ইনফেন্ট্রি ওয়ার্কশ কোম্পানী এবং স্টেশন সাপ্লাই ডিপো সমূহে কর্মরত বাঙালিদের সংখ্যা হচ্ছে উৎসাহব্যঞ্জক। তাদের ক্ষেত্রেও অন্যদের মতো বিপদ নেমে আসে। একই দিনে নিকটবর্তী বাস্কেটবল মাঠে একদল বাঙালি সৈনিককে নিয়ে আসা হয়। লোক দেখানো খেলাটি পাকিস্তানী কমান্ডোদের হেলমেট পরিহিত একটি দল উপভোগ করছিল। ওরা পাখি শিকারের মত করে খেলোয়াড়দের ওপরে গুলী ছুড়তে থাকে। বহুমারা যায়। কয়েকজন পালায়। আল্লাহ্ জানেন, ওরা পালাতে সক্ষম হয়েছিল কিনা।

পরের দিনও একই অবস্থা চলে। নির্মম জেরার খেলা এবং মৃত্যু অব্যাহত থাকে। ৫৩তম ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যরা মারণযজ্ঞের শয়তানি খেলায় মেতে ওঠে।

অপরাহ্ন ৪ টা। সশস্ত্র প্রহরায় পদাতিক ওয়ার্কশপ কোম্পানীর একদর বাঙালি সৈনিককে উপরের দিকে হাত তোলা অবস্থায় প্যারেড করতে দেখা যাচ্ছে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে যাদেরকে গণকবরে মাটি দেয়া হয়েছে তাদের কক্ষে গাদাগাদি করে উক্ত সৈনিকদের রাখা হয়।

দশ মিনিট পরে বারান্দা দিয়ে শেষ কক্ষের দিকে চলে যাবার ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। সেখানে ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিস সুপার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছেন। অকস্মাৎ গুলীবর্ষণের শব্দে ভবনটি কেঁপে ওঠে।

ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম বললেন– ওদের মেরে ফেলা হয়েছে। এখন আমাদের পালা।

যমদূত তাদেরকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে। সহসা একটি স্টেনগান দরজার কাঁচ ভেদ করে কক্ষে ঢুকে। লেফটেন্যান্ট ইমামের নিজস্ব রেজিমেন্ট সুবেদার স্টেন গান তাক করে রেখেছে। ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম এবং ক্যাপ্টেন সিদ্দিক হাতজোড় করে বলে– সাব, খোদাকে লিয়ে বাঁচাও। কথা শেষ হতে না হতেই ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলামের বুকে গুলী লাগে। তখনি তার মৃত্যু হয়। ক্যাপ্টেন সিদ্দিক ও অচেতন হয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলামের মুখ দিয়ে রক্তের বন্যা চলছে।

লেফটেন্যান্ট ইমাম এক দিকের দেয়ালে পিঠ রেখে নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থাকে। দেয়ালে ডজন খানেক ছিদ্র হয়ে গেছে। লেফটেন্যান্ট ইমামের দিকে বন্দুকের নল পুরোপুরি তাক করা যায় নি। তাই আপাতত সে বেঁচে আছে।

www.pathagar.com

লেফটেন্যান্ট ইমাম ভাবছে সে হয়তো আর কয়েক মিনিট বেঁচে থাকবে। তবু ডুবন্ত মানুষের মত একটি খড়ের আশ্রয় নেয়। সুবেদার দরজা থেকে সরে যাবার সাথে সাথে দ্রুতবেগে খাটিয়ার নিচে চলে গিয়ে বিছানার চাদর টেনে নিজেকে আড়াল করে। এটি বুলেটপ্রুফ ব্যবস্থা যে নয় তা সে জানে। তবু এছাড়া আর কোন পথ নেই।

দরজায় শব্দ হয়। কেউ তালা খোলার চেষ্টা করছে। হায়! আবার ঐ সুবেদার! হাতে স্টেনগান।

সুবেদার প্রকোষ্ঠে পা রাখে। লেফটেন্যান্ট ইমাম বুকফাটা চিৎকার করে। তাকে আর খুঁজতে হয় না। সুবেদার খাটিয়ার দিকে গুলী ছোড়ে। উপুর হয়ে শুয়ে লেফটেন্যান্ট ইমাম হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। গুলীর পরে নীরব থাকে। তার দেহ থেকে উত্তপ্ত রক্ত বেরিয়ে আসছে। কোথায় আঘাত লেগেছে তা সে জানে না। প্রথম গুলীর পরে সুবেদার ঝুলন্ত বিছানার চাদর উঠিয়ে নেয় এবং লেফটেন্যান্ট ইমামের ওপরে গুলী ঝরিয়ে দেয়। এভাবে স্টেনগানের গুলী নিঃশেষ করে। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইমাম নিস্তব্ধ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।

শেষ শিকারকে হত্যা করার বিজয়ী ভাব নিয়ে সুবেদার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

তিনটি রক্তাক্ত দেহ। জীবনের চিহ্ন নেই। একজন সৈনিক এসে তাদের দেহ পরীক্ষা করে। মেজর সুলতান সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সৈনিকটি তাদের মৃত্যুর নিশ্চয়তা স্বীকার করার পরে মেজর সুলতান উত্তেজনার পৈশাচিক হাসিতে চারদিক প্রকম্পিত করে তোলে। যাক! বাঙালিদেরকে জাহান্নামে পৌঁছানো গেল। হাসির ধ্বনি চলতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইইনিটের কয়েকজন কৌতূহলী সৈনিক দরজা-জানালার কাছে ভিড় করে। ওরা লেফটেন্যান্ট ইমামসহ অন্যদের একবার দেখতে চায়। সুবেদার সবাইকে তাড়িয়ে দেয়। পশ্চিম দিগন্তে ক্লান্ত সূর্যের রক্ত লাল বর্ণ চারদিকে বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে চলেছে।

কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঘনায়মান রাত। লেফটেন্যান্ট ইমামের মনে ক্ষীণ আশার আলো আর নিস্তব্ধ দেহ এখনো খাটিয়ার নিচে। ভাগ্যদাতা তাকে নতুন জীবন দিয়েছে। এটা কি তাহলে তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়ার জন্যে লাশগুলো অন্যত্র সরিয়ে ফেলার জন্যে দরজা খোলা হবে। সে কি ঐ

www.pathagar.com

সময়ই এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে বাইরে বেরিয়ে যাবে? না, তা করো না। দরদী দেবতা তাকে নিরস্ত্র করে। সে কি তার দেহ গণকবলে টেনে নেয়ার সুযোগ দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে? না, তখনো না। কবর থেকে পালানো সম্ভব নয়। এ কাজটি করলে হয়তো অপমৃত্যুর জন্য আফসোস করবে। আজ রাতেই কি তাহলে পালনো উচিত হবে? শুভাশিসরত নিয়মিত ইমামকে সে রাতেই পলায়নের ইঙ্গিত দিয়ে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে লেফটেন্যান্ট ইমাম তার হাত একটু নড়চড়া করে। তার হাতের আঙ্গুল আরেকটি আঙ্গুলের ছোঁয়া পেয়ে যায়। সেটা হচ্ছে এক ধরনের পারস্পরিক প্রক্রিয়া।

তুমি কি বেঁচে আছ?

ক্যাপ্টেন সিদ্দিকের কণ্ঠ বেজে ওঠে।

হ্যাঁ। তুমি?

লেফটেন্যান্ট ইমামের বিস্ময় জড়ানো কণ্ঠ। এ দুজনই শুধু জীবিত রয়েছে। ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম জবাই করা পশুর মতো পড়ে রয়েছে। ক্যাপ্টেন সিদ্দিক দুর্বল। তৃষ্ণার্ত। উঠতে চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধকণ্ঠে লেফটেন্যান্ট ইমাম জানতে চায়– "তুমি কি কোথাও যেতে চাও?" না, আমি পানি চাই। ক্যাপ্টেন সিদ্দিক টেবিল থেকে এক গেলাস পানি পান করে।

লেফটেন্যান্ট ইমাম বলে– চলো, পালিয়ে যাই।

– পালাবো? কি বলছো, তুমি? অসম্ভব! ওরা মেরে ফেলবে।

রক্তের স্রোতে শুয়ে ক্যাপ্টেন সিদ্দিক তখনো ভাবছে যে পাকিস্তানীরা তাকে হত্যা করার জন্যে গুলী করে নি। ক্যাপ্টেন সিদ্দিক পালিয়ে যাবার ধারণা মনে ঠাঁই দিচ্ছে না।

তখনো সে মনে করছে যে, গোলাগুলীর মধ্যে পড়ে যাওয়া ছাড়া বিষয়টি আর তেমন কিছু নয়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে লেফটেন্যান্ট ইমামের দেহ থেকে। কিন্তু তাকে কিছু একটা অবশ্যই করতে হবে। তার ডান চোখের কোণে আঁচড় কেটে গুলী ছুটে গেছে। তার ডান বাহুর ওপরের অংশে একটি বুলেটের ছিদ্র। মুখের বেশ কয়েক স্থানে গুলীর বিক্ষিপ্ত অংশ আঘাত করেছে। তার ডান কাঁধেও গুলী ছুঁয়ে গেছে। প্রচুর রক্তপাতের ফলে এতোটা দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তার পক্ষে খাটিয়ার তল থেকে বেরিয়ে আসাও সম্ভব হচ্ছে না।

www.pathagar.com

মধ্যরাত। বহু কষ্ট করে লেঃ ইমাম হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন সিদ্দিক বলে– "ইমাম! প্লিজ, পালাবেন না।"

"না। আমি এক গেলাস পানি চাই।" ইমাম ধীরে ধীরে দাঁড়ায়। দৃঢ়তার সাথে টেবিলের কাছে যায়। সতর্ক হাতে জানালা খুলে দেয়।

এক মুহূর্তও অপচয় না করে এক লাফে বাইরে এসে পড়ে। প্রহরী মাত্র ৫ ফুট দূরে। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রহরী হতভম্ব। বিভ্রান্ত আতংকিত। আর্তনাদ করে ওঠে। ইমাম বিদ্যুৎবেগে দৌড়াতে শুরু করে। ঢালে দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। আবার উঠে রাস্তার দিকে এগোতে থাকে। প্রহরীরা যখন প্রথমবারের মতো গুলী করে তখন ইমাম প্রায় দেড়শ' গজ পথ অতিক্রম করেছে। তার দিকে গুলী করে থাকে। রাস্তার কাছাকাছি একটি ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নেয়। সে সাদা পোশাক পরিহিত দুটো মানুষ আকৃতির শরীর দেখতে পায়। তার সামনে দাঁড়িয়ে। কৌতূহলী হয়ে সে দৃশ্য দেখে। তার মনে হয়, কোন পবিত্র আত্মার ছায়ামূর্তি যেন নির্দোষ বাঙালি হত্যার করুণ দৃশ্য অবলোকন করছে।

লেফটেন্যান্ট ইমাম আবার দৌড় শুরু করে। জামা ছিঁড়ে বিক্ষত হাতের অংশ বেঁধে নেয়। রাস্তা ধরে দৌড়াতে থাকে। সৈন্যরা ইতোমধ্যে পরিখায় অবস্থান নিয়ে গুলি শুরু করেছে। সেনা নিবাসের শেষ সীমানা আর মাত্র ৪০০ গজ দূরে। এ দূরত্বটুকু অতিক্রম করা মারাত্মক ঝুর্কিপূর্ণ। তাই তাকে সতর্কতার সাথে এগুতে হবে। এ সীমানা অতিক্রম করতে গিয়ে সে যদি হঠাৎ করে পরিখায় অবস্থিত পাকিস্তানী সৈন্যদের মুখোমুখি হয়ে যায়– তাহলে এক্ষেত্রে মৃত্যু অনিবার্য। ইমাম মাটির ওপরে শুয়ে পড়ে উত্তর দিকে গোমতী নদীর বাঁধের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে। শুরু হয় ট্রেসার বুলেট-এর শোঁ শোঁ শব্দ। হামাগুড়িই হচ্ছে তার বাঁচার জন্যে একমাত্র উপায়। তার আর কোন ভাবনা নেই। এমনকি মৃত্যুরও। স্থান-কাল এখন তার কাছে একাকার।

অবশেষে সে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে যে এখন আর বুলেট তার উপর দিয়ে যাচ্ছে না। এমন কি গুলির শব্দও এখন আর নেই। লেফটেন্যান্ট ইমাম স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। এসে পড়েছে বিপদমুক্ত এলাকায়। বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনুভব করে ইমাম। সামনেই গোমতী নদীর বিরাট উঁচু বাঁধ। দাঁড়িয়ে একলাফে উপরে ওঠে। বাঁধের পাশে সর্পিল গতিতে পূর্ব থেকে

www.pathagar.com

পশ্চিমে বয়ে চলেছে গোমতী নিবিড় গানের একটানা সুরেলা ধ্বনি ছড়িয়ে। কুমিল্লার দুঃখ গোমতী এখন ইমামের মুক্তিদাত্রী। গোমতীর বক্ষে লাফিয়ে পড়ে। সামনে তার গোমতীর আরেক তীর। সাঁতার কেটে লেফটেন্যান্ট ইমাম চলে সেদিকে।

লেফটেন্যান্ট ইমাম উত্তর পাড়ে পৌঁছে। "ভোরে বামহস্ত তখন আকাশে।" লেফটেন্যান্ট ইমাম নিজেকে টেনে দাঁড় করে। কয়েকজন গ্রামসী তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারা ইমামকে নিকটবর্তী ডিসপেনসারীতে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। আওয়ামীলীগ কর্মীরা সীমান্ত অতিক্রম করে তাকে নিয়ে মতিনগরে অবস্থিত সীমান্ত রক্ষীদের কাছে যায়। দিনটি হচ্ছে এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ। তার ক্ষত শুকোতে থাকে। লেফটেন্যান্ট ইমামের মানসিক এবং দৈহিক সজীবতা ক্রমশ ফিরে আসতে শুরু করে।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে কয়েকজন শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ডা ঃ ফজলে রাব্বি

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন এন্ড কারডিওলজিষ্ট বিভাগের প্রফেসর ছিলেন ডাঃ ফজলে রাব্বি। তিনি সকল ছাত্রদের কাছেই ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠজন। সদালাপী এবং মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পরকে আপন করে নিতে পারতেন। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন খুব সুখী। তার স্ত্রী ছিলেন একজন ডাক্তার। তার নাম ডাঃ জাহানারা রাব্বি।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই ঢাকায় মাঝে মধ্যে কারফিউ জারী থাকত আবার দু এক ঘন্টার জন্য কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হত। তখন ঢাকার আকাশে ভারতীয় বাহিনীর যুদ্ধ বিমান আকাশে উড়তে থাকত। আর নির্দিষ্ট জায়গায় বোমা ফেলত। আর গোলাগুলিতো অহরহই চলতো। এভাবে গোলাগুলিতে অনেক মানুষ মারা যেত।

ডাঃ ফজলে রাব্বি স্বাধীন বাংলাদেশের এত অধিক স্বপ্ন দেখতেন যে, সব সময়ই তার কল্পনায় এসে হাজির হত স্বাধীন একটা দেশের মানচিত্র। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রচুর সাহায্য করেছেন। কিন্তু সে স্বপ্নের স্বাধীনতা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তিনি দেখতে পেলেন না পত পত করে উড়া স্বাধীন দেশের পতাকা। তার ১৩ বছরের এক সন্তান নাম তার টিংকু সেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু দুমাস পর তাকে সীমান্ত থেকে ফিরিয়ে আনা হয়।

এক দিনের ঘটনা। ডাঃ ফজলে রাব্বি বেলা সাড়ে এগারোটায় বাসায় ফিরলেন। সাথে করে আনলেন অনেক মাছ, শাকশব্জি। স্ত্রীকে বললেন, দেখ কত কি এনেছি। পাকিস্তানী সেনাদের আত্মাসমর্পণের সময় খুব গোলমাল হতে পারে। তখন কোন জিনিস পাওয়া যাবে না। তার স্ত্রী কিন্তু নিরুত্তর। কারণ তার স্ত্রী বলেছিল সেদিন ঢাকা ছেড়ে অন্যে কোথাও চলে যেতে। স্ত্রীকে উপহাস করে বললেন, তুমি এতো সাহাসী অথচ এখন ভয় পাচ্ছ কেন? দুপুরে খাবার টেবিলে বসলেন। স্ত্রীকে বললেন, আজ এত ভাল

www.pathagar.com

করে খাবার খেলাম। খুব খাওয়ালে তুমি। স্ত্রীচুপ্ করে ছিল, কারণ সেদিন কোন রান্নাই হয় নি। আগের দিনের রান্না করা তরকারী দিয়ে ভাত দিয়েছিল।

প্রচুর বোমা পড়ছে। যুদ্ধ চলছে। রেডিওতে বিভিন্ন ভাষায় ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশয়ের আত্মসর্ম্পনের আহ্বান। এক অজানা সর্বনাস ভয়ে সবাই অস্থির। দুপুরে তার স্ত্রী অনুরোধ করল, চল এখান থেকে চলে যাই। একটা এ্যম্বুলেন্স ডাক। এ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন ও করেছিলেন। পরে বললেন, আচ্ছা, দুপুরটা গড়িয়ে যাক তার পর বের হব।

বিকাল চারটা। তিনি যুদ্ধ বিমান থেকে রকেট পড়া দেখছেন। এমন সময় কলিং বেলের আওয়াজ। বাবুর্চি এসে ফিস ফিস করে বলল, ওরা বাড়ী ঘোরাও করে ফেলেছে। তিনি সোজা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ওদের সাথে ছিল একটা কাঁদা মাখানো মাইক্রোবাস, একটি জিপ গাড়ী। তিনি নিচু গলায় পেছনে ফিরেই বললেন, টিংকুর মা, ওরা আমাকে নিতে এসেছে। পাকিস্তানী সৈন্য এবং তাদের সহযোগী বাহিনীর সদস্যরা ওপরে ওঠে এল। এবং ডাঃ ফজলে রাব্বিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠল। তার স্ত্রী সিড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে লাগল। তখন দুজন সৈন্য তার বুকের উপর রাইফেল তাক করে রাখল। স্ত্রী আর এগুতে পারল না। তাকে নিয়ে গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিকেল চার ঘটিকা।

বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন চলতে লাগল। কোন সংবাদ নেই কোথায় তাকে নেওয়া হয়েছে। অবশেষে কর্নেল হেজাজীর কাছে সংবাদ পাওয়া গেলে, তারা ডাঃ ফজলে রাব্বি, ডাঃ আলীম চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০জন প্রফেসরকে ধরে নিয়ে গেছে এবং কর্নেল হেজাজী আরো বলল, রাজীনৈতিক অপরাধে এদেরকে আটক করা হয়েছে। আগামীকাল সকালে দেখা যাবে।

১৫ ডিসেম্বর রাত তিনটায় মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ট্রাকে করে এদেরকে রায়ের বাজার একটি ইট খোলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাদেরকে হত্যা করা হয়।

ডাঃ রাব্বিকে পাকিস্তানী সৈন্যরা জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কি ডাঃ রাব্বি?

তিনি বলেছিলেন হ্যাঁ।

তুমি কত টাকা দিয়েছিলে মুক্তি যোদ্ধাদের?

আমি সরকারি চাকরি করি, আমি কোন আর্থিক সাহায্য তাদের করি নি।

www.pathagar.com

অনেক বন্ধু কান্নাকাটি করেছে কিন্তু ফজলে রাব্বি ছিলেন অবিচল। তিনি বলেছিলেন আমাকে যখন ওরা মেরেই ফেলবে তখন ওদের সাথে কথা বলা বৃথা। ১৬ ডিসেম্বর কর্নেল হেজাজী বলল, তাদের কি হয়েছে আমি জানি না। ডাঃ ফজলে রাব্বির লাশ খোঁজ করার জন্য ইউনাইটেড নেশন্স এর চেয়ারম্যান জন কেলির কাছে গিয়েছিল তার স্ত্রী ডাঃ জহানারা রাব্বি। এ সময় হোটেল ইন্টারকনে পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের খসরা তৈরি হচ্ছে।

১৮ ডিসেম্বর ডাঃ ফজলে রাব্বির মৃত দেহ খুঁজে পাওয়া গেল। তারা বুক ঝাঁরা হয়ে গিয়েছিল বুলেটে। শহীদের সারিতে একটি নাম যোগ হল। বাংলাদেশের মানুষ তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

১৯২৮ সালে ৯ জানুয়ারী বগুড়া জেলার একটি ছোট গ্রামে তার জন্ম হয়। তার পিতার নাম মৌলভী আবুল ফজল মুহাম্মদ সুলায়মান ও মাতার নাম সারে জাহাননেছা। তার পিতাও একমাত্র চাচা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। দাদীর নামে প্রতিষ্ঠিত তমিরুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ে দুই ভাই শিক্ষকতা করতেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ৪ ভাই ও দুবোন। শামসুদ্দীনের মা মারা যাবার পর তার পিতা আবার বিয়ে করেন কিন্তু সৎমা তাদের সাথে মায়ের মতই ব্যবহার করত।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাইস্কুলে লেখাপড়া করেছেন। তিনি প্রাইমারী থেকে বৃত্তি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুব অধ্যবসায়ী। তার লেখা পড়ায় ঝোক দেখে পিতার ইচ্ছা হয় ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবেন। ১৯৪৭ সালে আই. এস. সি পাশ করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করে দেন। তখন সব মিলিয়ে ২৮জন মুসলমান ছাত্র সেখানে লেখাপড়া করত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যাওয়ার কারণে ১৯৫০ সালে ঢাকায় আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং করেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫১ সালে বিদ্যুত প্রকৌশলী শামসুদ্দীন প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ঐ বছর শেষের দিকে কাপ্তাই পানি বিদ্যুত প্রকল্পে যোগদান করেন। তার কাজের দক্ষতা লাভের জন্য তিনি দুবার বিদেশে ট্রেনিং এ গমন করেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন কাপ্তাই পানি বিদ্যুত প্রকল্পটি তার যোগ্য কর্মস্থল। যার ফলে তিনি বদলী হয়ে ঢাকায় আসেন নি।

www.pathagar.com

আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন একজন দেশ প্রেমিক। তাই প্রতিদিন তিনি বলতেন কি হবে এ দেশের, কি হবে আমাদের জাতির ভবিষ্যত। যারা দেশকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত, দেশের লোকদের কল্যাণ কামনায় উদ্ভিগ্ন থাকত তাদের অনেকেরই বুক ১৯৭১ এর যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। অনেক মায়ের বুক হয়েছে খালি। অনেক স্ত্রী হয়েছে বিধবা, অনেকে হয়েছে পিতামাতা হারা।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। শামসুদ্দীন ছিলেন একজন প্রকৃত মানব প্রেমিক। বিহারী বাঙালী মিলে গড়ে তুলবে একটা সুন্দর দেশ। সুন্দর দেশের মানুষরা হবে সৎ পরিশ্রমী। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সবাই কাপ্তাইয়ে আলোচনা সভা এবং মিছিল করল। মিছিলে শ্লোগান ছিল বাঙ্গালী বিহারী ভাই ভাই, এদেশের সম্পদ আমাদের সম্পদ। আমাদের দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু এক অশুভ এলোমেলো বাতাসে সব তছনছ হয়ে গেল। কিশোর যুবকেরা সীমান্ত পারি দিয়ে ভারতে চলে গেল মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিতে।

কাপ্তাই পানি বিদ্যুত প্রকল্প চালু রাখাই ছিল তখন একমাত্র কর্তব্য তাই আবুল কালাম শামসুদীন ভারতে পারি দেন নি। তার কাজ ছিল একদিকে মুক্তি বাহিনীর ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা আবার অন্যদিকে অবাঙালীদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা। তার মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন কাপ্তাই পানি বিদ্যুত প্রকল্প চালু রাখা এবং এর মূল্যবান যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ করার কাজে। চট্টগ্রামের এক পাহাড়ের উপরে ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অফিস। বেতার যন্ত্রটি হঠাৎ বিকল হয়ে গেল। তিনি যন্ত্রপাতি একটি ব্যাগে ভরে ময়লা একটি সার্ট ও প্যান্ট পরে চট্টগ্রাম গেলেন বেতার কেন্দ্র ঠিক করতে। প্রচুর লোক কাপ্তাইয়ের পথ ধরে ভারতে চলে যাচ্ছে। তিনি বেতার কেন্দ্র ঠিক করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরলেন। সকলেই বলত, শামসুদ্দীন ভাই, আপনি ভারতে চলে যান, তা না হলে আপনাকে পাকিস্তানী সৈন্যরা হত্যা করে ফেলবে।

১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল। পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী কাপ্তাইয়ে প্রবেশ করে। বেলা সাড়ে তিনটায় পাকিস্তানী সৈন্যরা গাড়ী নিয়ে বাসার সামনে এসে হাজির হল। বাসায় ঢুকে প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞেস করে করমর্দন করল। পরমুহূর্তে রাইফেল তাক করে বলল হ্যান্ডস আপ। দুজন সৈন্য রাইফেলের

www.pathagar.com

নল দিয়ে তাদেরকে পিটে ধাক্কা দিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। এবং জিপে উঠিয়ে নিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, একজন পাঠান গাড়ী চালকের স্ত্রী তাদের কাছে বলছে যে, কাপ্তাই প্রকল্পের ম্যানেজার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নাকি এখানকার বিহারী ও উর্দু ভাষীদের হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। শামসুদ্দীনকে ধীরে নিয়ে যেতে দেখে দুজন উর্দুভাষী অফিসার ও দুজন আমেরিকান তাদেরকে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তারা একটা গাড়ী নিয়ে তাদের পেছনে অনুসরণ করেন। কিন্তু যারা মানুষ মারার নেশায় উম্মত্ত তাদের মন কিছুতে গলানো সম্ভব হয় না। রাইফেল তাক করে পেছনের গাড়ীকে বার বার ভয় দেখিয়ে নিষেধ করল যাতে তারা অনুসরণ না করে। ঐ জীপের একজন প্রত্যক্ষ দর্শীর বর্ণনা, শামসুদ্দীন মরণকে বীরের মত বরণ করে নিয়েছিলো। তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা করেন নি। কাপ্তাই বাঁধের মুখে দুজনকে জীপ থেকে নামাল। একজন মেজর আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বুকে রাইফেল তাক করে ধরল এবং গুলি করল। গুলিটা বুকের বাঁ দিকে হৃদপিণ্ডের ভেতরেই প্রবেশ করে বের হয়ে গেল। কিন্তু তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন দ্বিতীয় গুলিটি করা হল তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কাপ্তাইয়ের মাটি রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনি নিজের হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন অফিস প্রদান যা ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সগৌরবে পত পত করে উড়ছিল। যখন পাকিস্তানী সৈন্যের গুলির আওয়াজে পাহাড় ভারী হয়ে গেল তখন তিনি নিজের হাতেই পতাকা নামিয়ে ফেলেন।

সিরাজুদ্দীন হোসেন

সিরাজুদ্দীন হোসেন একজন সাংবাদিক ষাটের দশকের সূচনা থেকেই তিনি ৫ নং চামেলী বাগের বাসায় ভাড়া থাকতেন। সিরাজুদ্দীন হোসেনের সমগ্র চিন্তায় ছিল দেশ ও দেশের মানুষ। সংসারের সমস্ত ভার স্ত্রীর উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি খবরের কাগজের জগতে পরে থাকতেন। এত ব্যস্ত থাকতেন যে, স্ত্রী যদি কোন প্রশ্ন করত তবে বলতেন, আমাকে এখন কি চিনবে। চিনবে আমি মরে গেলে।

চামেলী বাগের বাসাটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে পাড়ার একমাত্র সংবাদ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত ছিল। পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যার পরপরই তিনি অফিসে

www.pathagar.com

রওয়ানা হলেন। সারাদিন তিনি ঘর ভর্তি লোকদের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাতের মধ্যভাগে সেনানিবাস থেকে সৈন্য বেরিয়ে পড়ল। রাজার বাগের পুলিশ লাইনে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন তখন রাতের অন্ধকারে বিভীষিকা ছড়িয়ে দিচ্ছে। রাজপথে ট্যাংকের বহর গর গর করে চলছে। এর মধ্যে নিরীহ মানুষেরা আর্তচিৎকার শুরু করে দিয়েছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে দলে দলে পুলিশ বেরিয়ে এসে আশ্রয় চাচ্ছে। সিরাজুদ্দীন হোসেন দৈনিক ইত্তেফাকে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা ইত্তেফাক ভবনে আগুন লাগিয়ে দিল।

২৭ মার্চ সকালে তিনি বাসায় ফিরলেন। চোখের সামনে ভয়াল দৃশ্যগুলো তিনি অবলোকন করেছেন। সমস্ত লোক তাকে ঘিরে ধরল সংবাদ জানার জন্যে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও আক্রমণ করেছে। দুদিন পরে তার ঘনিষ্ঠ খন্দকার মেহাম্মদ আবু তালেব মীরপুরে অবাঙালীদের হাতে মারা যান। খবরটি তার জন্যে খুবই মর্মান্তিক ছিল। তারা দুজন নর্থব্রুক হল রোডের একটি বাসায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। ফলে তাদের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে দালালেরা নিরীহ নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করছিল। এ সময় সাধারণত অবাঙ্গালী পেলেই তাকে হত্যা করা হত। ফলে অনেক নির্দোষ অবাঙালী হত্যার শিকার হয়।

২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার পরপর কার্ফু উঠিয়ে নেওয়া হয়। এর ফাকে দলে দলে লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যান। মহল্লায় যে কয়টি পরিবার অবশিষ্ট রইল তাদের একমাত্র ভরসা ছিল ৫নং চামেলী বাগের বাসাটি যেখানে সিরাজুদ্দীন হোসেন থাকতেন। বাসায় অল্প বয়সী ছেলেদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেল। এ ছেলেরাই মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এদের মাধ্যমেই তিনি বিভিন্ন তথ্য পাঠতেন ভারতে। সীমান্তের ওপার থেকে তাকে বার বার তাগাদা করা হল ভারতে যেতে কিন্তু তিনি গেলেন না। এর মধ্যে তার ছেলে শামীম মুক্তি যুদ্ধে যোগদান করল। তিনি মুক্তি যোদ্ধাদের ঋণ করে হলেও সাহায্য করতেন। সংসারের প্রয়োজনের চেয়ে মুক্তি বাহিনীর প্রয়োজনকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। তার কোন বিপদ আসতে পারে বললে তিনি বলতেন, আমি কি দোষ করেছি যে আমার বিপদ আসবে।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঠিক হল তিনি আশপাশেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন। ডিবিতে চাকুরীরত তার এক বন্ধুর অনুরোধে তাকে এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কিন্তু যেদিন তিনি বাড়ী থেকে বের হবেন সেদিনই তার এক বোন ছেলেপেলেসহ এল তার কাছে আশ্রয় চাইতে। ফলে তার বাড়ী থেকে বের হওয়া সম্ভব হল না।

১০ ডিসেম্বর। এদিনই তার জন্যে পৃথিবীর শেষ দিন। সেদিন রাতেই পাকিস্তানী সৈন্য এবং তাদের সহযোগীরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। তাকে এমনভাবে ধরে নিয়ে গেল যে একটা কথা বলার সুযোগও তিনি পেলেন না। রাত প্রায় তিনটে। ঘাতকেরা বাড়ী ঘোরাও করল। মুখোশ ধারীদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে সময় লাগল না। রাইফেল উদ্ধত করে পরিচয় চাইল। তিনি তার পরিচয় দিলে তাকে নিয়ে গেল। ডিসেম্বরের হাড় কাপানো শীতের রাত, শুধু গেঞ্জি লুঙ্গী পরেই গেলেন তিনি। ঘাতকেরা তাকে জামা পরার সুযোগও দিল না। একটি গামছা চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে গেল। সেই যে তাকে নিয়ে গেল আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ঘাতকেরা তাকে হত্যার করে গুম করে দিল। একজন স্বাধীনচেতা সাংবাদিকের কলম এভাবে স্তব্দ হয়ে গেল। আর কোন দিন তিনি ফিরে আসবেন না। ছেলে সন্তানদেরও আর আদর স্নেহ করবেন না। জনগণ তার নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান

বাংলাদেশে যে কয়জন বীরশ্রেষ্ঠ আছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন মতিউর রহমান। ১৯৬৮ সালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান স্ত্রীসহ। ইসলামাবাদ তখন বিশ্বের সুন্দর শরগুলোর মধ্যে একটি। পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের পরিশ্রমের ফসল হল ইসলামাবাদ।

মতিউর রহমান তার স্ত্রীর নিকট বলেছেন বাঙালীদের প্রতি পাকিস্তানীদের ঘৃণার কথা, খাওয়ার টেবিল থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে এ ঘৃণা বিরাজ করত। বাঙালীরা তাদের কাছ থেকে মানসিকভাবে অনেকবার বিপর্যস্ত হয়েছে। ওরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার জন্যে সব সময় ব্যস্ত থাকত। বাঙালীদের প্রতি ঘৃণার জবাব দিয়েছিলেন পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর মনোবলকে ভেঙ্গে দিয়ে।

২৫ মার্চের রাতে মতিউর ছিলেন গ্রামের বাড়ীতে। কর্মজীবনে এবারই সে গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিল। তারপর ঢাকায় আসল মুনিপুরী পাড়ার একটি

www.pathagar.com

বাসায়। পরে গুলশানে চলে যায়। পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু ঢাকাই নয় সমস্ত গ্রামে গ্রামে অত্যাচার চলতে লাগল। ওদের অত্যাচারের ভয়ে মানুষ ঢাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালাতে লাগল। পাকিস্তানীরা সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই গুলি করেছে। ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত মতিউর রহমান গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন। তারপর তিনি ঢাকা আসলেন। তিনি গ্রামে থেকে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য গ্রামের ছেলেদের ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী গ্রামে নিরীহ মানুষদের প্রতি বিমান থেকে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। এর মধ্যে মতিউর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের মৌরিপুর তার কর্মস্থলে যোগ দেয়। কর্মস্থলে যোগ দিতে দেরী হওয়ায় কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শাতে বলে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, স্যার আমি এখন যে কারণই বলিনা কেন তা আপনাদের কাছে সত্য বলে বিবেচিত হবে না। তবে ইতিহাস একদিন এর জবাব দেবে। উর্ধ্বতন অফিসারের সামনে এতবড় কথা বলা যে সে সময়ের জন্য কত বিপদজনক তা এমনিতে বোঝা যায়।

সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানী পাইলটদের দূরে সরিয়ে রাখা হল। রানওয়ের আশেপাশেও যাতে কোন পূর্ব পাকিস্তানী যেতে না পারে সে ব্যবস্থা নেওয়া হল। তখন মতিউর রহমানকে "ফ্লাইট সেফটি অফিসার' করা হল যার কাজ শুধু রানওয়ের মধ্যেই। এ সময় তিনি উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলেন। একদিন স্ত্রী ও ছোট মেয়েকে নিয়ে রানওয়ের কর্তব্যরত লোকদের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে বিমানের কাছে গেল। উদ্দেশ্য বিমান নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। কক পিঠে বসার পূর্বমুহূর্তে বললেন, ইঞ্জিন চালু করার জন্য পঞ্চাশ ভাগ ঝুকি নিতে হবে। স্ত্রী বললেন, অন্য কোন উপায় বের করা যায় না। মতিউর রহমান উত্তর দিলেন, এজন্যই মেয়েদের নিয়ে কোন বড় কাজের ঝুকি নেওয়া যায় না। তখন তারা আবার বাসায় ফিরে এল।

আবার নতুন করে চিন্তা শুরু হল। সাহায্য করলেন ফোয়াদ্রন আযম ও উইং কমান্ডার হুমায়ুন কবির। মানচিত্র তৈরি হল। ক্লোরোফরম ও তুলার ব্যবস্থা করা হল। এখন শুধু সুবিধামত দিন পাওয়ার অপেক্ষায়। পাকিস্তানী পাইলট ফ্লাইং অফিসার রশিদ মিনহাজ একা ফ্লাইট করবে আর মতিউর রহমান মিনহাজকে ক্লোরফরম দিয়ে আচ্ছন্ন করে দু চালক বিশিষ্ট বিমানটি

www.pathagar.com

হাইজ্যাক করে ভারতে পালিয়ে যাবে। সে অনুযায়ী ১৯ আগস্ট ভোরবেলা ফ্লাইং অফিসার মিনহাজদের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। কিন্তু সেদিন কাজ হাসিল করতে পারলেন না। বাসায় ফিরে আসলেন।

১৯ আগস্ট রাত নামলো। সমস্ত রাত বিছানায় ছটফট করলেন। ২০ আগস্ট ভোর বেলা স্ত্রীকে কিছু বলতে গিয়ে বললেন না। প্রতিদিনের মত কাপড় পরে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্মস্থলে যোগ দিলেন এবং সুবিধামত একটা বিমান পেয়েও গেলেন। সে বিমান নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু বিমানের যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিমান নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হলেন না। ভাগ্যে টেনে আনল মৃত্যু। স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে যেতে পারলেন না। তিনি সর্বশ্রেষ্ট সম্মানে ভূষিত হলেন বীর শ্রেষ্ঠ পদকে। তার নামে যশোর বেচের নামকরণ করা হয়েছে মতিউর রহমান ঘাঁটি। তার নামে প্রকাশিত হয়েছে ডাক টিকিট। বীর শ্রেষ্ট মতিউর রহমানের কথা বাংলাদেশের মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র — হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত
স্মৃতি ঃ ১৯৭১ ২য় খণ্ড — রশীদ হায়দার সম্পাদিত
মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ — এ. কে এম সফিউল্লাহ
স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় — সুখওয়ান্ত সিং
বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ — মোঃ বোরহান উদ্দিন খান
ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন — জান্নাতুন নাঈম
উনিশ'শ একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধ — মোহাম্মদ শামসুল হক
নয় মাসের মুক্তি যুদ্ধ — মোঃ আবুল হোসেন ভূইয়া
সমসাময়িক পত্র পত্রিকা
দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও
বিভিন্ন মাসিক ম্যাগাজিন।

www.pathagar.com

দৃষ্টি প্রকাশ
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১১০০

ISBN 984-8519-06-8

www.pathagar.com